চিরজনমের বেদনা

ছোট গল্প

জাহিদ কাওনাইন

সাপ্তাহিক ছুটির দিনের আজকের আকাশটা মেঘমুক্ত ঘন নীল। আকাশের ওই ঘন নীলে সুগভীর দৃষ্টি মেলে দিলে ওধারের সুদূর অজ্ঞাতলোকেরও যেন কী একটা ছবি দেখা যায়। এইরকম স্বচ্ছ নীল আকাশতলের মাটির 'পরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটি যেন সকলের প্রাণের বেগকে বাড়িয়ে দেবার মতোই সুন্দর। উজ্জ্বল রোদে আর ঝির্‌ঝিরে বাতাসে তৃতিদের বাড়ির বিশাল আঙিনায় ঘন পাতায় ছাওয়া গাছপালাগুলো সকাল থেকেই ঝলমল ঝলমল করছে। শহুরে যান্ত্রিক শব্দের ভেতরেও এখানকার সামান্য নীরবতায় গাছে গাছে নানান পাখির নানান শিস্‌ ভারি মিষ্টি শোনাচ্ছে। এইমাত্র দেয়াল ঘড়িটা ঢং ঢং শব্দ করে বেলা এগারোটা জানান দিয়ে দিল। অথচ ভাইয়াটা এখনও এল না। মনে হচ্ছে ভাইয়াটা আজ আর বোধহয় আসবে না। যদি আসতই তাহলে চিটাগাং ইউনিভার্সিটির হোস্টেল থেকে এতক্ষণে চলে আসত।

ক' দিন হল বাবা গেছেন অফিসের কাজে ঢাকায়। ফাঁকা বড়িতে তৃতি এখন একা। অবশ্য দ্বিতীয় আর–একজন যে আছে, সে হল সজনী। ঘুম থেকে উঠেই রান্নাবান্না এবং আরও নানানবিধ কাজে সে এতই ব্যস্ত থাকে যে ওকে কাছে পাওয়া ভার। কিন্তু আজকাল একাএকা থাকতে তৃতির খুব একটা খারাপ লাগছে না। আগে খারাপ লাগত। গত ক' দিন থেকে নিজের এই পরিবর্তনটা উপলব্ধি করতে পেরে তৃতি নিজের প্রতি নিজেই বিষম অবাক হয়ে গেছে। ভাবছে, জীবনের এই সময়টা বুঝি এই রকমই হয় !

একটু আগে সজনীকে এককাপ চায়ের কথা বলেছে তৃতি। চায়ের কথা বলে, সে তার কোমল পায়ের মৃদু ছন্দে হেঁটে তাদের সুসজ্জিত বসবার ঘরটিতে এল চলে। এসে, সোফায় বসে হাত বাড়িয়ে মোটা কাঁচ বসানো সেন্টার টেবিলের ওপর থেকে 'সংশপ্তক' নামক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকাটি নিল তুলে। তার পর অতি নিবিষ্ট মনে পত্রিকাটির পাতা উল্টাতে শুরু করল। অবশ্য চায়ের কথা সজনীকে বলবার আগে, তৃতি তাদের বসবার ঘরের ক্যাসেট–প্লেয়ারে গান লাগিয়ে দিয়েছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীত। মাসছয়েক আগেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের নামে তৃতি খুব নাক সিটকাত। অথচ, আজকাল রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে তার কী যে ভাল লাগে ! মানে, কেবল শোনাই নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীত যখন বাজে, তখন তার কথা ও সুরের সঙ্গে নিজের সুললিত কণ্ঠটিকে মিলাতেও তার বড় ভাল লাগে। আসলে, রবীন্দ্রসঙ্গীতে চিরকালের সকল ভাবের ভাষা এতই জোরাল এবং সার্বজনীন যে তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। তাছাড়া তার কথা ও সুর যে দেহের রক্তের ভেতরেও প্রেম–ভালবাসার কোমল স্পর্শ দিতে পারে, তা তৃতির আগে কখনও জানা ছিল না। এখন তার যে বয়স, তাতে সে তার প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে সেটাকে জেনেছে। তৃতি এখন বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছে যে, যে–বয়সটায় একাএকা মধুর একটা ভাবজগতে বিচরণ করতে ভাললাগে বেশি, সেই বয়সটার জন্যই বুঝি রবীন্দ্রসঙ্গীত। তবে বাংলাসাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগের সঙ্গে মনের ভেতরে যদি আদিকার রস মাখানো আধুনিক বাঙালিত্বের নম্রস্বভাবের সহজসরল ছন্দ না থাকে, তখন ব্যাপারটা অনেকের ক্ষেত্রে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়।

ক্যাসেট–প্লেয়ারে এখন যে গানটি বাজছে, সেটি দেবব্রতের কণ্ঠের,– আমার রাত পোহালো... । সংসপ্তকের পাতা উল্টিয়ে ছবি দেখতে দেখতে তৃতি তার সুছাঁদ কোমল ফর্সা রাঙা পায়ের তাল ঠুকছে কাশ্মীরী নকশাঅলা কার্পেটের ওপর।

এমনসময় টুংটাং ভারি একটা শ্রুতিমধুর মেলোডিতে বাড়ির ডোরবেলটি উঠল বেজে। তৃতির মনটা খুশিতে ভরে উঠল,– যাক ভাইয়াটা আজ তবে এল।

হাতের সাপ্তাহিকীটা সুদৃশ্য সেন্টার টেবিলের ওপরে রেখে সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তৃতি এগিয়ে গেল দরজায়। দরজার গায়ে বিবর্ধক কাচ–লাগানো পীপ–হোল। সেই পীপ–হোলে চোখ রাখতেই তৃতি দেখতে পেল জয়তীকে, জয়তীর হাতে ছোট একটা সুটকেস। সুটকেস হাতে জয়তী দাঁড়িয়ে আছে। একা।

জয়তী তৃতির চাচাতো বোন। তৃতির চেয়ে বছর দুয়েকের কিছু বড়। কিন্তু ওদের দুই চাচাতো বোনের মধ্যে সম্পর্কটা এতই মধুর যে, ওরা একে অপরকে বেঁধেছে তুই–তোকারি সম্বোধনে। জয়তী অবিবাহিতা। থাকে খাগড়াছড়িতে ওর বাবা–মা আর ছোটবোনটির সঙ্গে।

দরজার ওপাশে জয়তীকে সুটকেস হাতে একাএকা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তৃতি বিস্ময়ভরা মনে দরজা খুলে বললে, 'ও–মা ! তুই যে !'

সেই অতি পরিচিত মিষ্টি হাসি জয়তীর চোখেমুখে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, 'কেন বিশ্বাস হচ্ছে না ? ভুত দেখবার মতো চমকে উঠলি নাকি ?'

আসলে তৃতির বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে, জয়তী খাগড়াছড়ি থেকে চিটাগাংয়ে এইরকম একাএকা আসতে পারে। কারণ, সে এই প্রথম জয়তীকে তাদের বাড়ির দরজায় সুটকেস হাতে একলাটি দেখল। এর আগে যখন জয়তী এসেছে, তখন সঙ্গে তার কেউ–না–কেউ থাকতই। হয় ছোট বোনটা নয়তো মা–বাবার একজন।

তৃতি বিস্ময়টাকে চোখে ধরে রেখেই জিজ্ঞেস করলে, 'একা এসেছিস !'

'হ্যাঁ রে। একাই এলাম। জরুরি একটা কাজে একাই আসতে হল। তিন–চার দিন থাকব।' জয়তীর কণ্ঠস্বরে ক্লান্তি প্রকাশ পেল।

তৃতি বললে, ‘চাচা তোকে এত দূরের পথে একা একা ছাড়ল !’

হেসে ফেলে জয়তী বললে, ‘ছাড়ল তো।’

‘বলিস কী ! নিষেধ করেননি?’

‘করেছে। বলেছে, দিনকাল ভাল না, একাএকা চিটাগাং যাওয়াটা কি তোর ঠিক হবে? তুই পারবি নাকি একাএকা যেতে? আমি বললাম, না পারার কী আছে। বাবা অবশ্য মা’ কে আমার সঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন। আমিই নিষেধ করে বললাম, একবার একাএকা যাওয়া–আসা করে দেখিই না পারি কি–না? তো বাবা তাতে রাজি হয়ে গেলেন।’

তৃতি জয়তীর একটা হাত ধরে বললে, ‘যাক্ ভালয় ভালয় যে এসে পৌঁছেছিস, ভালই হল। এবার সুটকেসটা নামিয়ে রেখে সোফায় বস্। বসে, খানিক বিশ্রাম কর্। ফ্যানটা ছেড়ে দিই?’

জয়তী বললে, ‘দে, ফ্যানটা ছেড়ে দে। যা গরম পড়েছে, ঘেমে নেয়ে গেছি !’ বলে হাতের লেদার সুটকেসটা একপাশে নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই তৃতি হঠাৎ কী এক বিষম আনন্দে জড়িয়ে ধরল জয়তীকে।

জয়তী তৃতির এই জড়িয়ে ধরা আচরণের মানেটা জানে। তার পরেও তৃতির আলিঙ্গনে আবদ্ধ থেকেই জয়তী বললে, ‘কি রে কী হল !’

‘তোকে দেখে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। কী যে ভাল লাগছে, বলবার নয় ! ইচ্ছে হচ্ছে...।’

‘কী ইচ্ছে হচ্ছে শুনি?’

‘চেঁচিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে।’

‘আর?’

‘লাফাতে।’

‘আর?’

‘গান গাইতে।’

‘আর?

‘মাটিতে সুখের গড়াগড়ি খেতে।’

‘কেন রে ! তুই বুঝি আমাকে খুব ভালবাসিস !’

‘সে তো তুই জানিসই।’ বলে জয়তীকে ছেড়ে দিয়ে বললে, ‘এবার কিন্তু তুই সাত মাস পরে এলি।’

‘আর বলিস নে। খুব ব্যস্ত থাকতে হয় তো, তাই।’

রবীন্দ্রসঙ্গীতটা তখনও শেষ হয়নি। শেষ অংশটুকু তখনও বাজছে,– সময় যে তার হল গত নিশিশেষের তারার মতো,—– শেষ করে দাও শিউলিফুলের মরণ–সাথে।।

জয়তীকে টেনে এনে সোফায় বসাল তৃতি। তার পর দেওয়ালের গায়ের ফ্যানের রেগুলেটরটা ঘুরিয়ে দিয়ে এসে বসল জয়তীর গা ঘেঁষে।

এতক্ষণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাপারটা জয়তী খেয়ালই করেনি। এইবার গানের চরণের সঙ্গে সুরটি কানে প্রবেশ করতেই জয়তী অবাক চোখে তৃতির দিকে তাকিয়ে বললে, ‘ব্যাপার কী রে ! তুই শুনছিস রবীন্দ্রসঙ্গীত ! এ তো বিপদ সংকেত ! প্রেমসাগরের বিপদ সংকেত ! তবে, কত নম্বর বিপদ সংকেত কে জানে !’ বলেই খানিক মজা করার জন্য জয়তী তৃতিকে বললে, ‘সে যাই হোক, আই হ্যাভ অ্যা ভেরি গুড্ নিউজ ফর ইউ।’

‘হোয়াটস্ দ্যাট্?

‘ভালবাসা এবং বিয়ে।’

এক চোট হেসে নিয়ে তৃতি জয়তীকে বললে, ‘কনগ্রাটস্ জয়তী।’

‘আমি জানি তুই ছেলেটাকে দেখে অপছন্দ করবি না।’

‘তোর পছন্দকে অপছন্দ করে, কার সাধ্য বল্?

‘ছবিও এনেছি তোকে দেখাব বলে।’

‘কই দেখি দেখি?’

‘এখনই না, একটু রসো ভাই, রসো। ফ্যানের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে আগে খানিক জিরিয়ে নিই। তারপর ধীরেসুস্থে দেখাবখন। তবে তৃতি, ছেলেটির ছবি দেখানোর পর তোকে তার সম্পর্কে বিস্তারিত যখন বলব, তখন অবভিয়াসলি ইউ উইল কনসিডার ইয়োরসেল্ফ দ্যাট্ ইউ আর লাকি।’

কথাটি শুনে, তৃতির মনে এবার একটা খটকা লাগল। মনেমনে মুহূর্তে সে ভেবে নিল, জয়তী কার জন্যে ছেলেটিকে ঠিক করেছে ! ও কি আমার জন্যে কোনও ছেলেকে ঠিক করেছে ! তাই ভুরু কুঁচকে তৃতি বললে, ‘মানে ! তুই আমার জন্যে কাউকে ঠিক করেছিস !’

‘হ্যাঁ রে হ্যাঁ, তোর জন্যে। তবে, ছবি দেখানো এবং তার সম্পর্কে কিছু বলার আগে, আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ সামথিং।’

তৃতি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললে, ‘আমি ছবিও দেখতে চাই নে এবং তার সম্পর্কে কিছু শুনতেও চাই নে। আর আমাকে ওইসব ব্যাপারে কোনও কিছু জিজ্ঞেস করারও কোনও দরকার নেই।’

‘ও–মা ! তুই কী রে ! এতেই এত লজ্জা পেয়ে গেলি?’

‘বাদ দে তো ও–সব কথা।’ বলে প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে জয়তীকে জিজ্ঞেস করল তৃতি, ‘জয়তী, তুই বাসে চেপেই খাগড়াছড়ি থেকে

চিটাগাংয়ে আসলি নাকি?

'হ্যাঁ, বাসে।'

'পাহাড়িয়া পথে বাসে চড়তে তোর ভয় করে না?'

'ভয় করে লাভটা কী? ওপথে ভাল যানবাহন বলতে তো আছে ওই বাস আর ট্যাক্সি। তাছাড়া ওপথে বাসে চড়াতেই যত মজা। হাত-পা ছড়িয়ে কী আরাম করে বসা যায়!'

'তা ঠিক। তবুও...।'

'তবুও আবার কী রে! তুই তো জানিস, ওপথে বাসে চড়ে কত কী পাহাড়িয়া সৌন্দর্য দেখা যায়। এক নজরে যেন পুরো পৃথিবীটার অনেকখানিই দেখা যায়।'

'তা তুই ঠিকই বলেছিস। টানেলের ট্রেনে, আকাশের প্লেনে আর সাগরের জাহাজে চড়ে পৃথিবী দেখায় কোনও সুখ নেই।'

তৃতির কথায় মৃদু হেসে জয়তী বললে, 'জানিস, এই কথাটা কিন্তু আমিও আমার পরিচিত মহলের সবাইকে বলি।'

জয়তী বসবার ঘরের এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে বাড়ির ভেতরটাকে আন্দাজ করে নিয়ে বললে, 'কী রে বাড়িতে কারও সাড়াশব্দ নেই দেখছি। চাচা কোথায়?'

'বাবা দিন পাঁচেকের জন্যে ঢাকায় গেছেন। তাঁর কী সব নাকি কনফারেন্স-টনফারেন্স আছে হেড-অফিসে।'

'দ্যুলোকটা গেছে কোথায়?'

'ভাইয়া? ভাইয়ার কথা আর বলো না। ভাইয়া তো আজ প্রায় দু' মাস হতে চলল ইউনিভার্সিটির হোস্টেলে গিয়ে উঠেছে।'

'কেন রে!'

'পড়াশোনার ভীষণ চাপ। সামনে এম.এ. পরীক্ষা।'

একটু ভেবে নিয়ে জয়তী বললে, 'ও ঠিকই করেছে। কোথায় সেই চিটাগাং ইউনিভার্সিটি আর কোথায় এই নন্দনকানন। পথের ওপর যাওয়া-আসায় তিনঘন্টা সময় রোজ রোজ নষ্ট করবার কোনও মানেই হয় না। তারচে হোস্টেলে থাকলে ক্লান্তিহীন মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতে পারবে।'

'ওই জন্যেই তো বাবা ভাইয়াকে বলেছে, হোস্টেলে তোর যখন সীট্ রাখাই আছে তো পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই ক' টা মাস তুই বরং হোস্টেলে গিয়েই থাক। কিন্তু আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দ্যাখ। আজ শুক্রবার। ছুটির দিন। বাবা দু' দিন আগে ঢাকায় গেছেন ট্যুরে। ভাইয়াটাও হোস্টেলে। সজনী আমাকে রান্নাবান্নার কাজে যেতেই দেয় না। জোরজার করে আমি যদি রান্নাঘরে ঢুকতে চাই, তাহলে সজনী কী বলে জানিস?'

আগ্রহের সঙ্গে জয়তী জানতে চাইল, 'কী বলে?'

তৃতি হেসে ফেলে বললে, ''বলে,- আফা যদ্দিন আফনে এহানে আছেন, আফনেরে রাঁধন-বাড়ন লাগব না। বিয়া হইলে কই-না-কই গিয়া পড়বেন কেডা জানে! সারা জীবনই তো রাইন্ধ্যা-বাইড়া খাইতে হইব।... তো এখন তু-ই বল্ আমার কলেজের ছুটির দিনে একা একা আমি কী করে সময় কাটাই? আর ছুটির দিনটায় সারাক্ষণ ঘরে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে কারও কি ভাল লাগে?'

তৃতির লম্বা-চওড়া নালিশ শুনে জয়তীও হেসে ফেলল। বললে, কেন রে ছুটির দিনেও দ্যুলোক কি হোস্টেল থেকে বাড়িতে আসে না?'

'আগে আসত। গত শুক্রবারের আগের শুক্রবারেও ভাইয়া এসেছিল। সে-দিন হোস্টেলে ফিরে যাবার সময় ভাইয়া বলে গেছে এখন থেকে নাকি শুক্রবারেও আর আসতে পারবে না। পরীক্ষা শেষ হলে, তবেই সে বাড়িমুখো হবে।'

'তাহলে তো ছুটির দিনে তুই খুব লোন্‌লি ফিল করিস!' বলে জয়তী তৃতিকে সহানুভূতি জানালে।

'সে আর বলতে!' বলে আক্ষেপ প্রকাশ করল তৃতি।

জয়তী বললে, 'ঠিক আছে, যদ্দিন দ্যুলোকটা বাড়িতে না ফিরছে তদ্দিন তোর কলেজের ছুটির দিনগুলো না-হয় ম্যাগাজীন-ট্যাগাজীন পড়ে কিংবা কোথাও বেড়িয়ে-টেড়িয়ে কাটিয়ে দে।'

'ধুস্। কোথায় বেড়াবো রে! কোথাও বেড়াতে যাবার কী কোনও উপায় আছে? তুই-ই বল্? নেই। কোনও উপায় নেই।' বলে বারকয়েক ডানে-বাঁয়ে মাথা ঝাঁকালে তৃতি। তারপর বললে, 'দেশের রাজনীতিতে যে-রকম ছন্নছাড়া উন্মাদনা, আর সেইসঙ্গে দেশের পথেঘাটে অলিতে-গলিতে পার্কে-পাহাড়ে মাস্তানদের যে-রকম রংবাজির রাজত্ব, তাতে করে মেয়েদের পক্ষে একাএকা নিরিবিলিতে কোথাও বেড়াতে যাবার কথা ভাবাই যায় না। দেখছিস না, পত্রপত্রিকায় প্রতিদিন ধর্ষণ আর খুনখারাপির খবর কীরকম ছাপা হচ্ছে! এতে করে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সখটা আমার গেছে মরে। এছাড়াও প্রতিদিনকার খবরের কাগজে আরও যে সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর খবরাখবর আর ছাইভস্ম ছাপা হচ্ছে, ইচ্ছে হয় ডাস্টবিনে চেলে ফেলে দিই। সেই একই কথার কচলা-কচলি। কতকাল আর ওই একই কথা পড়তে ভাল লাগে বল্? আসলে গঠনমূলক কাজকর্ম করবার ক্ষমতাটি এদেশের মানুষজন তালেগোলে পড়ে হারিয়ে ফেলেছে। অবস্থাটি এমনই দাঁড়িয়েছে যে, দেশ আর দেশের মানুষকে বাঁচাতে এগিয়ে যাবে? যাও। ঠেঙিয়ে পা ন্যাঙড়া করে দেবে। দেশের যাতে ভাল হয়, সেই কথা বলবে? বলো গে। থাবা মেরে মুখ বন্ধ করে দেবে। উচিত কথা লিখে খবরের কাগজে ছাপাবে? ছাপাও। হাতের কব্জি আর আঙুলগুলো ভেঙে গুড়িয়ে দেবে। তবে, একদিক দিয়ে বাঙালিদের ভাগ্য ভালই বলতে হয় যে, দেশের এই চরম অরাজকতার মধ্যেও বাংলা গানটানগুলো এখনও খানিক অক্ষত আছে। ছুটির দিনে ওইসব গান শুনেই যা-একটু সময় কাটে আর কী।

'আসলেই রে! তুই ঠিকই বলেছিস।'

'তাহলে বল্ ছুটির দিনে ঘরে বসে ওই এক গান শোনা ছাড়া আর কী করি?'

জয়তী বললে, 'সেই তো ! জানিস, খাগড়াছড়িতেও কিন্তু তোর মতো একই বন্দি দশা আমার। চাকরির ক্ষেত্রের বাইরে সখ করে কোথাও গিয়েছি কিনা, কিংবা কোথাও গিয়ে সামান্য অসতর্ক হয়েছি কিনা, বিষম বিপাকে পড়ে যেতে হয়।'

তৃতি বললে, 'সে নাহয় গেল, কিন্তু আসন্ন ভয়ের কথাটা কী জানিস ?'

'কী ?'

'ইদানীং বাঙালিদের দুই কাঁধে হিন্দি আর ইংরেজি গান ধীরেধীরে যেভাবে ভর করে বসছে, তাতে করে ভারি ভয় হয় যে, বাংলাগানের বাংলা সুরটির অকাল মৃত্যু না ঘটিয়ে ওরা বোধহয় ছাড়বে না।'

'অ–উ–ফ !' বলে নাকমুখ কুঁচকে মনের ঘৃণাটি প্রকাশ করে জয়তী বললে, 'আমার কী মনে হয় জানিস্ ?'

তৃতি বললে, 'কী ?'

জয়তী বললে, 'আমরা বাঙালিরা কিন্তু বড়ই অনুকরণপ্রিয়। সবার আগে এই বাজে অভ্যাসটি আমাদের সবাইকে ছাড়তেই হবে। নইলে ধ্বংশ আমাদের অনিবার্য।'

'তা ঠিক।'

'আমরা তো জানি, আমাদের হাজারও সমস্যার ভেতর সবচেয়ে বড় সমস্যা হল আমরা নিয়মনীতিহীন একটা জাত। তো এই বড় সমস্যাটা সমাধানের উপযোগী একটা ক্ষেত্র তৈরি না করেই হঠাৎ পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমরা আমাদের দেশটিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আজ যেমন মাস্তনতন্ত্রের খোঁয়াড়ে আটকা পড়ে গিয়ে বেরোবার কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছি না, ঠিক তেমনি ওই একই অনুকরণপ্রিয়তার কারণে বিদেশি আধুনিকতার রঙঢঙ ফলাতে গিয়ে হিন্দি এবং ইংরেজি গানের দাপটের কাছে আমাদের নম্রকোমল প্রাণছোঁয়া বাংলাগানের কথা আর সুর হয়ে পড়বে জগাখিচড়িতে বন্দি।'

তৃতি মাথা নেড়ে বললে, 'তোর এই কথার সঙ্গে আমি একমত। আর দেশ সম্পর্কে আমারও ওই একই কথা, নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র ছাড়া গণতন্ত্র গণতন্ত্রই নয়।'

ক্লান্তিতে হাই তুলে জয়তী বললে, 'হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমি জোর গলায় বলতে পারি, বাংলাদেশের অর্থলোভী সব রাজনীতিবিদ এবং তাঁদের উত্তরপুরুষদের অরাজক শাসনের বেড়ি থেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্তি পাওয়া যায়, ততই মঙ্গল বাংলাদেশের মানুষের। এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে দরকার হিতৈষী দয়ালু এবং পরোপকারী বাঙালীদের সমবেত শক্তি। কারণ, অপদার্থ ওইসব রাজনীতিবিদদের অরাজক শাসনের অবসানের সঙ্গেসঙ্গে এ–দেশের মাটি থেকে অর্থবান হওয়ার রাজনীতির মূলোৎপাটন যতদিন না সম্ভব হবে, ততদিন এ–দেশে রাজনৈতিক উন্মাদনা এবং মাস্তানীর অবসান হ–বে–না। আরও কি জানিস ?'

'কী ?'

'বাঙালিদের মনের মধ্যে বিষম একটা বৈষম্য আছে ?'

'কী সেই বৈষম্য ?'

'জীবদ্দশায় বাঙালিরা যে যা নীতিজ্ঞান অর্জন করে, তা সে অপর বাঙালিকে প্রাণপণে শেখাতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তাঁরা তা নিজেকে কখনই শেখান না।'

'মানে ?'

'স্বশিক্ষার অভাবটাই আমাদের সবচেয়ে বড় অভাব।'

'ঠিকই বলেছিস। আমাদের ক্ষেত্রে তোর এই কথাটা খুবই খেটে যায়।'

'এটা আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য। বাঙালিরা সত্যিকার অর্থে বিবেকবান না হলে আমাদের দুর্ভাগ্য কোনওদিনও সৌভাগ্যে রূপান্তরিত হবে না। আর এই দুর্ভাগ্যের দুঃসময় কাটিয়ে উঠতে এখনও আমাদেরকে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে অনেক ভোগান্তি ভুগতে হবে। তৃতি, থাক এসব কথা। তো ওই যে তুই গানটান শুনে সময় কাটানোর কথা বললি না ? ভালই তো। কলেজের লেখাপড়া আর অবসরে গান শোনা। চমৎকার ! সেইসঙ্গে ভবিষ্যতের কথাও একটু–আধটু ভেবেটেবে সময় পার করে দেয়া। মজাই তো। তারপর, শ্বশুরবাড়ির জল–হাওয়া গায়ে লাগলে দেখবি সে কী আনন্দের সাগর !'

তৃতির ঠোঁটে মুহূর্তে মেঘের কোলের আলোকচ্ছটার মতো সামান্য হাসি খেলে গেল। বললে, 'শ্বশুরবাড়িটা আনন্দের সাগর না দুঃখের সাগর কী করে বলি ! তু–ই বা আনন্দের সাগর বলছিস কী করে ! শ্বশুরবাড়ি, সে তো আমার মতো তোরও কল্পনার আকাশের একটা অজানা উদ্যান। আর ওই উদ্যানে বর নামক রাজপুত্রটি যে আসলেই আমাদের জীবনের বর, নাকি নাবালক খোকা হয়ে দাঁড়াবে কে জানে !'

'তা তুই বলেছিস বটে একখানা কথার মতো কথা ! না মেনে উপায় নেই। মেয়েদের ভবিষ্যতের কথা কি জোর দিয়ে বলা যায় ? যায় না।' বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জয়তী।

চায়ের কথা মনে পড়তেই তৃতি হেঁকে ডাকল সজনীকে, 'ও সজনী, এসো এসো, দ্যাখো কে এসেছে। দু' কাপ চা হাতে করে এসো।'

রান্নাঘর থেকে তৃতির মতোই উঁচু স্বরে সজনী জবাব দিল, 'ও আফা, গলার স্বরেই আমি বুঝবার পারছি বড়আফায় আসছেন। আমি চা লইয়া এক্ষনি আসতেছি।'

মিনিট পাঁচেক পর সজনী ট্রে–তে করে চা নিয়ে এল বসবার ঘরে। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট আর চানাচুর।

উথলে পড়া যৌবন সজনীর।

সজনী গরীবের মেয়ে।

বাংলাদেশের শহর উপশহর আর গাঁ–গঞ্জের অধিকাংশ গরীব বাবা–মায়েদের যৌবনবতী মেয়েদের কপালের লিখন ওই একটাই,–

চৌদ্দ কী পনেরোয় বিয়ে। সাইকেল রেডিয়ো আঙটি আর হাতঘড়ির বিনিময়ে বিয়ে। বিয়ে শেষে বিদায়কালে মা–বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে গরীবের মেয়ের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদাকাটা। তারপর লাজুক লাজুক পায়ে লজ্জামাখা হাসিতে শ্বশুরবাড়িতে এসে ওঠা। এরপর শুরু হয় সেখানে গরীবের মেয়ের সংসার। চলতে থাকে গরীবের মেয়ের ওপর দিনের পর দিন কমপক্ষে তিন–চারবার সহবাস নামক ভালবাসার অত্যাচার। কখনই স্বামী নামক কামপীড়িত দস্যু মহারাজকে বাধা দেওয়া যাবে না। যখনই তিনি চাইবেন, তখনই গরীবের মেয়ের যৌবনকে স্বামীসেবায় উৎসর্গ করতে হবে। নইলে তিনি অভিমান করে বসেন। অভিমান থেকে রাগ। রাগ থেকে জেদ। জেদ থেকে মদ–তাড়ি। মদ–তাড়ির সঙ্গে বাজারের মেয়েমানুষ চেখেটেখে রাত একটায় বাড়ি ফেরা। ইত্যাদি সাত–সতেরো ব্যাপার–স্যাপার। তো এই নিয়েই গরীবের মেয়ের সঙ্গে প্রথমে একটু আধটু কথা কাটাকাটি। কথা কাটাকাটি থেকে শুরু হয় কিল–চড়–থাপ্পড়। শেষ পর্যায়ে, গরীবের মেয়ের মাথার চুলের মুঠি ধরে বাড়ির উঠানে প্রায় বিবসনা করে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া। অবশেষে বাবার বাড়িতে গরীবের মেয়ের প্রত্যাবর্তন। এই তো হল বাংলাদেশের প্রায় আশি ভাগ গরীবের মেয়েদের জীবন কাহিনী।

অনেকটা এইরকমই একটা জীবন কাহিনী আছে সজনীরও।

পনেরোতে বিয়ে হয়েছিল। বিয়েটা হয়েছিল ময়মনসিংহে। কারণ সজনীরা তখন ময়মনসিংহেই বসবাস করত। ছেলেটাও ছিল ময়মনসিংহের। কিন্তু চাকরি করত খাগড়াছড়ির এক বিড়ি ফ্যাক্টরীতে। তাই বিয়ের পর বরের সঙ্গে সজনীকে চলে আসতে হয়েছিল খাগড়াছড়িতে। খাগড়াছড়িতে এসেই সজনীর কাজ জুটে গেল ওই একই বিড়ি ফ্যাক্টরীতে। দিনকতক পরে সে একদিন টের পেল বরটি তার হাড়–বজ্জাত, নেশাখোর। বিড়ি ফ্যাক্টরীর মালিক ফৈজুদ্দীন মিয়া সজনীর রূপ–যৌবন দেখে সজনীর বরের বেতন দিল বাড়িয়ে। বারো শো টাকা থেকে একলাফে দুই হাজার টাকা। সজনীর বরটি তখন আনন্দে আটখানা। ব্যস, আর যায় কোথা ! ঔইটুকু মেয়ের কপালে যে এই ছিল কে জানত? চোখের স্বপ্ন মনের স্বপ্ন সব ভেঙে খান খান হয়ে গেল সজনীর। শেষে, একে ওকে হাতেপায়ে ধরায় কে একজন যেন দয়াপরবশে সজনীকে লুকিয়ে জয়তীর বাবার কাছে পৌছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। জয়তীর বাবা ছিলেন খাগড়গছড়ির নামকরা ব্যবসায়ী। বিশাল হৃদয়, দয়ালু ভদ্রলোক। তিনি সজনীর মুখ থেকে স্বামীর সমস্ত কাণ্ডকারখানার কথা শুনবার পর ব্যাপারটা নিজের হাতে তুলে নেন। এবং একজন উকিল নিয়োগ করে আইন অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে দেন। বিবাহ বিচ্ছেদের দিন পনেরো পর তিনি সজনীকে সঙ্গে করে তৃতিদের বাড়িতে অর্থাৎ তাঁর আপন বড়ভাইয়ের বাড়িতে রেখে আসেন। সেইসঙ্গে ময়মনসিংহে সজনীর বাবা–মায়ের কাছেও খবরটা পাঠিয়ে দেন যে, তারা যেন তাদের মেয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকেন। এবং সামান্য কিছু টাকাও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মনি–অর্ডার করে যাতে সজনীর বাবা–মা চিটাগাংয়ে এসে মেয়েকে স্বচক্ষে দেখে যেতে পারে।

তো সজনী বসবার ঘরে ট্রেতে করে চা-বিস্কুট–চানাচুর নিয়ে এসে চোখেমুখে নীরবে হেসে বললে, 'বড়আফা, আফনে যে আসছেন হেইডা আমি গলার স্বরে আগেই টের পাইছি। নেন চা–বিস্কুট খান।' বলে তৃতি এবং জয়তীর সামনে সেন্টার টেবিলের ওপর চা–বিস্কুট–চানাচুরের ট্রেটা নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করল, 'বড়আফা, চাচায় কেমন আছেন? চাচী ভালা তো? ছোডআফায় ভালা তো?'

জয়তীও মিষ্টি হেসে বললে, 'হ্যাঁ, ভাল। সবাই ভাল। তুমি কেমন আছ?'

'এই যেমুন দেখতাছেন। বড়ই ভালা আছি। আল্লাহ রাখছে ভাল।'

তৃতি সজনীকে বললে, 'শোনো সজনী, তোমার বড়আপা এ বাড়িতে বরাবর যে ঘরটায় থাকে, সেই ঘরে এই সুটকেসটা নিয়ে গিয়ে রাখ।'

সজনী হাসিমুখে একপাশে মাথা হেলিয়ে বললে, 'আচ্ছা।' বলে দরজার পাশ থেকে সুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে ভেতরে চলে যেতে উদ্যত হতেই জয়তী হাসিমুখে বললে, 'একটা কথা সজনী।'

'কী কথা বড়আফা?' থমকে দাঁড়াল সজনী।

'তোমার সজনী নামটা কিন্তু আমার ভারি পছন্দের নাম। তোমার এই সুন্দর নামটা কে রেখেছিল?'

'আমার মায়ে।'

'তাই? তো সজনী নামের অর্থটা তোমার মনে আছে তো?'

'কী যে কন্ না বড়আফা ! যে–ভাবে আপনি আমার নামের অর্থ আমারে বুঝাইছেন, সারা জম্মেও তা ভুলুম না।'

'কী অর্থ বলো তো শুনি?'

সজনী লজ্জায় তৃতির দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললে, 'সুইট হার্ট।'

'আরও একটা শব্দ বলেছিলাম...।'

'ওইটাও মনে আছে। লেডি–লাভ।'

'আর–একটা বলেছিলাম, বাংলায়।'

'অন্তরঙ্গ বন্ধু।'

'বাহ ! তোমার স্মরণশক্তি তো খুব ভাল !'

শুনে সজনী হাসল। তার পর সুটকেস হাতে ভেতর ঘরের দিকে যেতে যেতে বললে, 'বড়আফা আফনে তৃতি আফার লগে গপ্‌টপ্ করেন, চা–টা খান। আমি আগে আফনার ঘর গুছাইয়া দিয়া রান্নাবান্নার কাজকাম সাইরা ফালাই।'

জয়তী বললে, 'আচ্ছা ঠিক আছে।'

সজনী চলে যেতেই জয়তী তৃতিকে প্রশ্ন করে বসলে, 'আচ্ছা তৃতি, তুই তো কোনও কালেও রবীদ্রসঙ্গীত শুনতে চাইতিস না। আজ যে বড় শুনছিস? তোর ব্যাপারটা কী বল্ তো?

ওই সময় ক্যাসেট–প্লেয়ারে অন্য আর–একটা গান হচ্ছিল দেবব্রতের কণ্ঠেই,– বৈশাখ হে মৌনী তাপস, কোন্ অতলের বাণী...।

তৃতি জয়তীর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে লজ্জামাখা স্বরে বললে, 'কী জানি কেন। জানি না। তবে নিঃসঙ্গতা ভুলতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আর জুড়ি নেই। শোনবার সঙ্গেসঙ্গে মনটা যেন ভারি সুন্দর একটা গোলাপের মতো পবিত্র হয়ে ওঠে। কখনও লালগেলাপ, কখনও সাদাগোলাপ, কখনও হলুদগোলাপ।'

কথাটা শুনে জয়তী অবাক হয়ে তৃতির মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল।

তৃতি একসময় বললে, 'অমন হাঁ-করে আমার দিকে তাকিয়ে আছিস কেন ! আমি কি হাঁ-করে তাকিয়ে থাকবার মতো কোনও অদ্ভুত কথা বললাম নাকি ?'

জয়তী হকচকিয়ে গিয়ে বললে, 'না না, তা কেন ! আমি আমার নিজের জীবনের একটা কথা ভাবছিলাম।'

'তাই বল্। নে বিস্কুট-চানাচুর খেয়ে চা খা। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। বলে তৃতি একটা বিস্কুট নিয়ে মুখে তুলে আলতো করে কামড়াল।

'নিচ্ছি।' বলে জয়তীও সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমার হাত দুটো পথের ময়লায় কালি হয়ে গেছে। হাতটা আগে ভাল করে সাবান দিয়ে ধুয়ে আসি।'

তৃতি বিস্কুটে হাল্কা আর-একটা কামড় বসিয়ে ভেঙে খেতে খেতে বললে, 'যা, বেসিনের ওপর লিকুইড হ্যাণ্ডসোপ রাখা আছে।'

তৃতিদের লাল সিরামিকের বাড়িটা বারো জাতের গাছপালায় ঘেরা। বাড়িটা একতলা। বাড়িটার চারদিকের মোয়িং-করা সবুজ-ঘাসে-ছাওয়া সমতল আঙিনাটিকে দেখে মনে হয় যেন ওখানটায় সবুজ নরম কার্পেট বিছানো। সেই সবুজ নরম আঙিনার ওপর তৃতিদের বাড়িটার চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে উঁচুউঁচু নানান গাছপালা। সেইসব গাছপালায় আঁকাবাঁকা হয়ে উঠে যাওয়া সুবিস্তৃত অসংখ্য ডালপালায় ঘনসবুজপাতার সমারোহে যে-একটা গন্ধবর্ণসৌন্দর্যসমৃদ্ধ বৃক্ষসাহিত্য রচিত হয়েছে এবং দিবারাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত সেখানকার বৃক্ষপত্রপল্লব মৃদুপবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মৃদুমন্দ ধ্বনিতে অতি উঁচুদরের যে-একটা সঙ্গীত-তরঙ্গ রচনা করে চলেছে, সেই বৃক্ষসাহিত্য এবং প্রাকৃতিক সুর-তরঙ্গের মধ্যে রৌদ্রালোকিত তৃতিদের বাড়িটার সামনেকার এবং পেছনকার আঙিনাটিকে ভারি সুন্দর দেখায়। আসলে, তৃতিদের এই বাড়িটিকে ঘিরে চারপাশে দিবানিশি যে-একটা অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিদ্যমান, তাতে করে এটাই মনে হয় যে, এখানকার সূর্যস্নাত সকালটা যেন সূর্যস্নাত কোনও এক শুভ্রসুন্দর কুমারীমেয়ের দেহেররূপের আলোর মতো জ্বলজ্বলে। দুপুর যেন কোনও এক বিরহিনীর চঞ্চল-মনের এবং নীরব-চোখের চাহনি। বিকেল, সে তো সদ্যবিবাহিতা কোনও এক লাজুকলতা মেয়ের মুখের মতোই কমনীয়। সন্ধ্যা, সে যেন নাকে নলকপরা কোনও এক শ্যামাঙ্গিনী গাঁয়ের বঁধুর মতোই শান্ত এবং স্নিগ্ধ। তাছাড়া, নক্ষত্রালোকে এখানকার রাতের আঁধারটি যেন জোনাকির আলো আর ঝিল্লিধ্বনির মুখরতায় প্রকৃতির চিরসত্য এবং চিরসুন্দর রূপটি হয়ে দেখা দেয়। জোছনারাতে, এবাড়ির আঙিনাকে ঘিরে মায়াময় আলোছায়ার রূপটি কী যে এক অবাস্তব জগত রচনা করে তোলে যে, একে চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। কী দিন কী রাত্রি, একপলক চোখে দেখলেই বাড়িটিকে বাগানবাড়ি বাগানবাড়ি ব' লেই যেন মনে হয়। তৃতিদের বাড়ির সামনেকার অর্ধগোলাকার বারান্দাটা মোজাইক করা এবং বেশ বড়সড়। পেছনেও আছে সুপ্রশস্ত আর-একটা বারান্দা। সেটা ছাদহীন খোলা বারান্দা।

তৃতির বাবা প্রতিদিন অফিস থেকে বাড়িতে ফেরেন বিকেল সাড়ে-পাঁচটা থেকে সন্ধ্যে ছ' টার মধ্যে। ফিরে, বাথরুমে ঢুকে গোসল-টোসল সারেন। তার পর জলযোগ শেষে একটা সিগারেট ধরিয়ে বাড়ির পেছনকার ওই খোলা বারান্দায় চুপচাপ একাকী বসে থাকেন একটা চেয়ারে। সন্ধ্যা অবধি ওখানে একাকী বসে থেকে তিনি যেন বেশ একটা আনন্দ পান। হয়তো-বা ওখানকার নিরিবিলিতে বসে থেকে তিনি তৃতির মায়ের মুখটিকে মনে করে নানান সব কথাগুলোকে ভাবেন। সম্ভবত তাতেই তিনি তার জীবনের নিঃসঙ্গতার মধ্যে সামান্য একটু হলেও সুখ খুঁজে পান। কোনও কোনও দিন তৃতি তার বাবার চোখে জলও দেখেছে। হাতে সিগারেট জ্বলছে। সিগারেট টানার কথা তিনি ভুলে গেছেন। ওইরকম পরিস্থিতিতে তৃতি কোনও কথাটথা না বলে বাবার পাশের অন্য আর-একটা চেয়ারে এসে চুপচাপ বসে থাকে। খানিকক্ষণ বাদে বাবা যখন তাঁর হাতখানা তৃতির কাঁধের ওপর আলতো করে রাখেন, তখন তৃতি বুঝতে পারে, বাবার মনটা হালকা হয়েছে। তারপর সন্ধ্যে উতরে যাবার পর বাবা বসবার ঘরের সোফায় এসে বসেন। বসে, রিমোট কন্ট্রোল চেপে টেলিভিশনটা চালু করেন। টেলিভিশনের কোনও চ্যানেলে কোনও ভাল নাটক কিংবা সিনেমা থাকলে, তিনি সেটা দেখেন, নয়তো, হালকা শব্দে অডিয়ো ক্যাসেটের গান চালিয়ে দিয়ে একটা উপন্যাস খুলে তাতে মন বসান।

আজ ক' দিন হল বাবা বাড়িতে নেই। কন্ফারেন্স অ্যাটেণ্ড করতে তিনি ঢাকায় গিয়েছেন। কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকলে বাবার মনটা বড়ই ভাল থাকে। বাবাকে হাসিখুশি দেখতেই তৃতির যত আনন্দ এবং তৃপ্তি।

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষে তৃতি জয়তীকে নিয়ে বাড়ির পেছনকার সুপ্রশস্ত খোলা বারান্দাটায় গিয়ে বসল। চেয়ারে নয়। পা ঝুলিয়ে দু' জনেই বসল বারান্দার পাকার ওপর, পাশাপাশি।

ফুলেরবাগান আর নানান গাছগাছালিতে ভরা বাড়ির পেছনকার আঙিনাটা এখন জ্যোৎস্নায় চমৎকার ভরে উঠেছে। বাগানটার এককোণে হাস্নাহেনার ঝোপ। তারই মিষ্টি গন্ধ মাঝেমধ্যে নাকে এসে লাগছে। তৃতি বললে, 'খাগড়াছড়ি গার্লস্ স্কুলে তোর মাস্টারি এখন কেমন চলছে রে জয়তী ?'

'ভাল।'

'কীরকম ভাল ?'

'মোটামুটি ভাল।'

'মোটামুটি ভালটাকে একটু খুলেই বল্ না।'

‘তাহলে শোন্। স্কুলে মাস্টারি করার একটা বড় যন্ত্রণা কি জানিস?’

‘কী?’

‘ছয় থেকে ষোলো বছর বয়সী মেয়েদেরকে পড়ানোর হ্যাপা কিন্তু কম নয়।’

‘তাই?’

‘হুঁ।’

‘কী রকম বল্ তো শুনি?’

‘ওই ছয় থেকে ষোলো বছর বয়সী মেয়েদেরকে পড়াতে গিয়ে অনর্গল এত বকবক করতে হয় যে বলার নয়। বকবক করতে করতে মুখ ধরে আসে। ঠোঁটের কোণে ফেনা জমে যায়। কিন্তু উপায় নেই। পড়ানোর জন্যে বকবক আমাকে করে যেতেই হবে, যতক্ষণ না পিরিয়ড্ শেষ হবার ঘন্টা পড়ছে। উহ্! সে যে কী কষ্ট! তারপর, এ–মেয়ে পড়া বোঝে তো ও–মেয়ে বোঝে না। ও–মেয়ে বোঝে তো এ–মেয়ে বোঝে না। তখন ওই পড়া বোঝানোর বকবকানিটা নূতন করে করতে হয় শুরু। আর একনাগাড়ে অমন বকবক করতে করতে খানিক বাদে মাথাটা এমন ধরে যায় যে, সেটা তখন একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। শুধুই কী এই! এ–ছাড়া আরও কতরকম যে ঝামেলা আছে তা তোকে বলে শেষ করা যাবে না। এ ওকে চিমটি কাটছে তো ও একে একটু চুল টেনে দিল, কাগজের উড়োজাহাজ বানিয়ে এ ওর দিকে ছুঁড়ে মারছে, কেউ আবার খাতায় পেন্সিল দিয়ে কাটাকাটি খেলা করছে, কেউ কোলের ওপর বই খুলে রেখে দস্যু বাহরাম পড়ছে। কেউ–বা ঘুমে একেবারে ঢুলে পড়ছে। এতশতর পরেও ওরা আরও কী করে জানিস? ওরা এমনই পাজি যে, ঘন্টা পড়বার পাঁচ মিনিট আগে থেকেই মেঝের ওপর পায়ের জুতোর সমবেত ঘষঘষানি এমনভাবে শুরু করে দেয় যে আর পড়ানোই হয় না। তো, স্কুলের মেয়েদের এইসব দুষ্টুমিকে সামাল দিয়ে পড়াতে গিয়ে একেবারে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়।’

‘তাই তো দেখছি! তো, ওদেরকে আর দোষ দেব কী!’ বলে খিলখিল করে তৃতি হেসে উঠে বললে, ‘আরে অমন পাজি তো ছোটবেলায় আমরাও ছিলাম। মিনাক্ষী দিদির হাতের কানমলা কি কম খেয়েছি!’

‘তা ঠিক। আমিও অমনটা করেছি। ছোটবেলার ওইসব কথাগুলো ভাবতে ভারি ভাল লাগে।’ বলে জয়তী জ্যোৎস্নাভাসা গাছগাছালির দিকে একবার চোখ তুলে তাকাল। তার পর তৃতির দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, ‘হ্যাঁ রে তৃতি, একটা কথা লোকে বলে।’

‘কী কথা?’

‘বলে, আট ঘন্টা কেউ যদি একনাগাড়ে বকবক করে, তবে নাকি আট মিনিট আয়ূ তার জীবন থেকে কমে যায়।’

‘বলিস কী রে! এ–কথা তো আমি কখনও শুনিনি।’

‘লোকে বলে আর কী! কথাটা কতটা সত্যি–মিথ্যে সে আমি জানিনে। তবে লজিক্যালি এই কথাটা আমার কাছে সত্য বলেই মনে হয় যে, প্রতিদিন বাঁধা সময়ে পরিমিত খাওয়াদাওয়া করা, হিংসা–বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকা, সৎ এবং সাধারণ জীবন যাপন করা আর সপ্তাহে একদিন মানে চব্বিশ ঘন্টা যদি নির্বাক থাকা যায়, তাহলে, সুস্থভাবে দীর্ঘায়ু হওয়ার সম্ভবনাটা বাড়ে। সেইসঙ্গে বাইরের নির্মল মুক্ত বাতাসে প্রতিদিন নিয়মিত একআধঘন্টা হাঁটাহাঁটি করলে দেহের যৌবনটিকেও ধরে রাখা যায় দীর্ঘদিন।’

‘তা যায় বই কী।’ বলে একটু থেমে তৃতি বললে, ‘তুই তো খুবই ভাল ছাত্রী ছিলি রে। তো বি.এ. পাশ করে এম.এ.–টা পড়লি না কেন?’

‘কী জানি কেন!’ বলে একটু চুপ করে থেকে জয়তী পুনরায় বললে, ‘কেন যেন আর ইচ্ছেই হল না পড়াশোনাটা চালিয়ে যাই।’

‘এম.এ.–টা পাশ করে তুই যদি কোনও কলেজে চাকরি নিতিস, তাহলে কিন্তু স্কুলের মতো প্রতিদিন তোকে আট ঘন্টা ধরে বকবক করতে হত না। এবং প্রতিদিন আট মিনিট করে তোর আয়ূও কমত না। বুঝলি, কলেজের মাস্টারির মজাটাই তো আলাদা। সারাদিনে দু’ তিনটের বেশি ক্লাস নিতে হয় না।’

‘হ্যাঁ, সেটা এখন বুঝতে পেরেছি। বি.এ. পাশ করবার পর পড়াশোনাটা ছেড়ে দিয়ে সত্যিই খুব ভুল করেছি।’ বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জয়তী। তার পর বললে, ‘দেখি, স্কুলের চাকরিটা এবার হয়তো ছেড়েই দেবো, দিয়ে, এম.এ.–টা পড়ে ফেলবার চেষ্টা করব।’

‘দ্যাখ্, তুই যেটা ভাল বুঝবি, করবি। তোর তো আর টাকাপয়সা নিয়ে তেমন কোনও চিন্তাভাবনা নেই যে তোকে স্কুলের চাকরিটা করতেই হবে।’

‘হ্যাঁ, বাবাও তো সেই কথা বলেন, সখের খাটুনি করছো, করো। তবে দেখো, সকাল–বিকেল এমন খাটাখাটুনি করে যেন অসুস্থ হয়ে না যাও।’

তৃতি এবার তার গলার স্বরটা সামান্য নীচু করে বললে, ‘আচ্ছা জয়তী, একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস করি…।’

‘কী কথা?’

‘বি.এ. পাশ করবার পর খাগড়াছড়ি কলেজের কোন্ একজন শিক্ষকের সঙ্গে তোর একটা মধুর সম্পর্ক তৈরি হয়েছে না?’

জয়তী ঘাড় বাকিয়ে তৃতির মুখের দিকে তাকাল, ‘হ্যাঁ, তা একটা সম্পর্ক বলতে পারিস গড়ে উঠেছিল।’ বলে কী একটা গভীর ভাবনায় চুপ করে রইল জয়তী। একবার মুখ তুলে আকাশের দিকেও তাকাল। তাকিয়ে যেন অতীতের কিছু কথাকে মনে করবার চেষ্টা করল।

তৃতি কৌতূহল বশত জানতে চাইল, ‘একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলছিস কেন! সেটা কি এখন আর বজায় নেই!’

খানিকটা সময় নীরবে পার করবার পর জয়তী লম্বা একটা শ্বাস ফেলে নিজেকে স্বাভাবিক রেখেই বললে, ‘আজকাল বোধহয় ভালবাসার গুণগত চরিত্রটা অনেক পালটে গেছে তৃতি। একটা সময় ছিল, যখন বাগানের যে–কোনও একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে, প্রেমিক

তার প্রেমিকার হাতে সেটা তুলে দিয়ে কিংবা ফুলটা প্রেমিকার খোঁপায় গুঁজে দিয়ে তার ভালবাসার আনন্দটাকে সুন্দর প্রকাশ করত। কিন্তু আজকাল বোধহয় সেইরকম সহজসরল সুন্দর প্রেম–ভালবাসাটা আর নেই।'

জয়তীর মুখের কথাটি শুনে চোখভুরু এক করে তৃতি বললে, 'ওমা ! এ–কথা বলছিস কেন !'

'না, এমনি।'

'না, নিশ্চয় কোনও কারণ আছে।'

জয়তী ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসল, 'কারণ তো অবশ্যই একটা আছে।'

'তোর নিজের জীবনে কি এইরকম কিছু ঘটেছে !'

'আরে, আগে তুই শোন্ই তো। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গেসঙ্গে অস্বাভাবিকভাবে সবকিছুর কেমন একটা পরিবর্তন হয়, সেই কথাটাই তোকে আমি বলতে চাচ্ছি।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, বল্।'

'হ্যাঁ, তো সেই একই ফুল, পরিপাটি করা, সুন্দর, চড়া দামে কোনও একটা ফুলের দোকান থেকে কিনে প্রেমিকার হাতে তুলে দিয়ে তাকে বিছানায় না নেয়া পর্যন্ত আজকালকার পুরুষদের কাছে ভালবাসা যেন একেবারেই অর্থহীন। বলতে পারিস তৃতি, কোন্ ভালবাসায় সুখ আর আনন্দটা বেশি?'

তৃতি চট্পট্ সংক্ষেপে বললে, 'যে ভালবাসায় পবিত্রতার আলো বেশি, সেই ভালবাসায় সুখ–আনন্দটাও বেশি।'

'একথাটা তো বরাবর আমিও ভাবতাম। কিন্তু আজকাল আমি ভেবে পাইনে, প্রেম–ভালবাসার স্বর্গসুন্দর সেই একমাত্র রূপটা এই মাটির পৃথিবী থেকে কোথায় গেল হারিয়ে?'

তৃতি ভাবিত মুখে বললে, 'আসলে কি জানিস, আজকালকার মানুষজনদের মধ্যে পাপবোধটা আগেকার মতো আর তেমনটি নেই। সেই কারণেই সে তার ভালটা মন্দটা ঠিকমতো বুঝতেই পারে না, ফলে, সে যখন যা করতে চায়, সেটা করতে পারলেই সে যেন নিজেকে ধন্য মনে করে এবং ধন্য মনে করে গৌরবও বোধ করে। মনে করে আমি তো জিতে গেছি। শোন্ জয়তী, এ–রকম মানুষজন থেকে তুই কিন্তু দূরে দূরে থাকবি। বুঝলি? আর হ্যাঁ, তোর সেই মনের মানুষটি কেমন রে? নিশ্চয়ই খুব ভাল? ভদ্রলোকের নামটা কিন্তু তুই আমাকে আজও বলিসনি। আমার অজানাই রয়ে গেছে।'

জয়তী তৃতির এই কথার কোনও উত্তর দিল না। না দিয়ে, জ্যোৎনাস্নাত গাছগাছালির ছায়ার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে বসে রইল।

তৃতিও আর কিছু বলল না।

এমন সময় ডানায় শব্দ তুলে একটা বাদুর কোথা থেকে যেন উড়ে এসে বসল পাঁচিলের ওধারের ডুমুর গাছটায়। ডালেপাতায় তারই সামান্য খশ্মশ্ শব্দ হল। জয়তী ভুরু কুঁচকে সেই দিকে তাকাল। তাকিয়ে, হঠাৎ কী একটা রাগে–দুঃখে দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'কী লাভ ওই ইতরটার নাম শুনে। আই হেইট্ হিম।'

তৃতি বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে বললে, 'এতক্ষণ আমি কিন্তু তোর কথাবার্তার ভেতর সেই রকমই একটা আবছা আভাস পাচ্ছিলাম। তো তুই ওকে আচ্ছাসে একটা শিক্ষা দিলি না কেন?'

তৃতির মুখের দিকে ফিরে তাকাল জয়তী। তার চোখেমুখে দুঃসহ বেদনার ছাপ সুস্পষ্ট, 'সুযোগটা পেলাম কোথায়? খাগড়াছড়ি থেকে ও পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে ! বলিস্ কী !'

'হ্যাঁ রে, ইতরটা ভয়ে পালিয়েছে।'

'পালিয়ে কোথায় যেতে পারে, সেটা কি বের করেছিস?'

'পালানো মানুষকে খুঁজে বের করা ভারি শক্ত ব্যাপার।'

'সে আমি জানি। কিন্তু খাগড়াছড়ি ছেড়ে সে কোথায় গেছে, সেই খবরটা তো তুই ওর কলেজের ডিপার্টমেন্ট থেকেই নিতে পারতিস।'

'আরে তৃতি, তোর যে দেখছি এখনও ছেলেমানুষের মতোই কথা ! শোন্, যে কিনা অপরাধ করে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করে, সে কী ঠিকানা দিয়ে পালায় রে ! ওই ইতরটি যে আমার সকল বন্ধনকে একেবারে অস্বীকার করেই পালিয়েছে। আর সেই কারণেই ও ওর ডিপার্টমেন্টেও কোনও কিছু বলে যায়নি। ও যে এমন একটা ধূর্ত শিয়াল কে জানত ! দিনকতক আগে, ওরই এক জানাশোনা লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ভদ্রলোকটি ভদ্র এবং বিনয়ী। পেশায় ব্যবসায়ী। খাগড়াছড়িতেই তার একটা খামারবাড়ি আছে। সেদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরবার পথে ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হতেই কথাবার্তায় এবং আভাসে ইঙ্গিতে তিনি আমাকে যা বললেন, তাতে বুঝলাম যে, চিটাগাং শহরেরই কোথাও কোনও একটা প্রাইভেট কোম্পানীতে ওই ইতরটা নাকি জয়েন করেছে। তবে এটাও যে কতটা সত্যি, তাতেও তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

বসবার ঘরের টেলিফোনটা বেজে উঠল। ক্রিং–ক্রিং–ক্রিং। টেলিফোন বাজার শব্দ শুনে সজনী ভেতরকার কোনও একটা ঘর থেকে দ্রুত পায়ে এসে টেলিফোনের রিসিভারটা কানে তুলে বললে, 'হ্যালো।' এরপর হ্যাঁ হ্যাঁ, জ্বি–আচ্ছা টাইপের মাথা নেড়ে দুই–একটা কথা বলে রিসিভারটা চিত করে রেখে বসবার ঘর থেকে বাড়ির পেছনকার খোলা বারান্দায় এসে তৃতিকে বললে, 'আফা আফনের টেলিফোন।'

তৃতি জিজ্ঞেস করলে, 'কে টেলিফোন করেছে?'

'ওই যে কয়দিন ধইরা যিনি রোজ রাইতে আফনের লগে কথা কন, তিনি।'

‘ও...তিনি !’ বলে তৃতি উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুতপায়ে বসার ঘরে চলে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভার কানে তুলে নিল, ‘হ্যালো, তৃতি বলছি।’

‘হ্যালো, আমি। তৃতি, তুমি কেমন আছ?’

‘আরে আপনি যে ! হ্যাঁ, আমি ভাল আছি। আপনি?’

‘আমিও ভাল আছি। তৃতি...।’

‘বলুন।’

‘আগামী কাল তুমি কি খুব ব্যস্ত থাকবে?’

‘কেন আগামী কাল তো আমার কলেজ আছে। কলেজে যাব?’

‘আরে বাবা, কলেজে তো তুমি যাবেই। কিন্তু আমি জানতে চাইছি আগামী কাল কলেজের ক্লাস শেষ হবার পর তুমি কী করবে?’

‘কেন?’

‘আগে বলোই না কলেজের পর তুমি কী করবে ব’ লে ভেবেছ?’

‘তেমন বিশেষ কিছু না। কলেজ থেকে সোজা বাড়ি চলে আসব।’

‘কলেজ থেকে সরাসরি বাড়িতেই কি তোমাকে ফিরে যেতে হবে?’

‘হুঁ।’

‘বাড়িতে ফিরে যাবার আগে আমার সঙ্গে একটিবার কি দেখা করতে পারবে?’

‘কেন?’

‘তোমাকে ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে।’

‘ওমা ! কেন !’

‘জানি না। তবে, ইচ্ছে করছে। খুবই ইচ্ছে করছে। এতই ইচ্ছে করছে যে, মন বলছে এখনই তোমাদের বাড়িতে চলে আসি।’

‘তাই?’

‘হ্যা তৃতি।’

‘তো হঠাৎ আপনার মনটা এত উতলা হয়ে ওঠার বিশেষ কী কারণ ঘটল !’

‘জানি না।’

তৃতি ঈষৎ হেসে ফেলে মজা করবার জন্য বললে, ‘ভালই হল, জানেন না যখন, তখন দেখা না হলেও আমার মনে হয় কিছু যায়-আসে না।’

‘না না, কী বলছ তুমি ! আসলে আমার মন খুব করে চাইছে যে, আগামী কাল বিকেলবেলায় তোমার সঙ্গে আমার দেখা হোক। এবং ক্যাফে টেকনাফে বসে দু’ জনে একসঙ্গে চা-কফি খেতে খেতে কথা বলি।’

‘উহুঁ, সম্ভব না।’

‘কেন সম্ভব না?’

‘কারণ, আমি আমার রক্তের সম্পর্ক ছাড়া এ-পর্যন্ত কারও সঙ্গে কোনওদিনও কোনও ক্যাফে কিংবা রেষ্টুরেন্টে বসে চা-কফি খাইনি বা আড্ডা দিইনি।’

‘কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার যে-একটা সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছে গত দু’ সপ্তাহে, তাতে করে, আমাদের দু’ জনের মধ্যেকার সেই সুসম্পর্কটা রক্তের সম্পর্কের চাইতেও আরও বেশি অসাধারণ একটা সম্পর্ক নয় কি?’

‘তা অসাধারণ বই কী।’

‘তাহলে প্লিজ আগামী কাল এসো না কেন ক্যাফে-টেকনাফে?’

‘আসতেই হবে?’

‘অবশ্যই। এবং এলে, আমি কী যে খুশি হব !’

‘বেশ আসব।’

‘এই তো ভাল মেয়ের মতো কথা।’

‘বাট আই অ্যাম্ নট্ কামিং অ্যালোন।’

‘হু উইল বি উইথ ইউ?’

‘ওয়ান অভ্ মাই কাজিন উইল বি উইথ মি।’

‘ইজ ইট?’

‘এতে কি আপনার কোনও অসুবিধা আছে?’

‘অভ্ কোর্স নট্।’

‘তাহলে আগামী কাল বিকেলে আমরা আসছি ক্যাফে-টেলনাফে।’

‘এসো এসো উইদাউট অ্যানি হেজিটেশন।’

‘ক’ টার সময় আসব?’

‘সন্ধ্যে ছ’ টার পর। ঠিক সাড়ে-ছ’ টায়।’

'ঠিক আছে।'

'থ্যাঙ্কস্।'

'ও.কে.। থ্যাঙ্ক ইউ ফর কলিং মি। সি ইউ টু-মরো।'

'সি ইউ।'

মিনিট সাতেক পর তৃতি হাসিমুখে ফিরে এসে বসল জয়তীর পাশে।

জয়তী হঠাৎ কী এক কৌতূহলে প্রশ্ন করলে, 'কে ফোন করেছিল রে তৃতি?'

তৃতির মুখটা লজ্জায় সামান্য নত হয়ে গেল। চাঁদের আলোয় জয়তী সেটা স্পষ্ট দেখতে পেল। বললে, 'বুঝেছি। কবে থেকে রে?'

'আর বলিস নে নাছোড়বান্দার মতো ধরেছে।'

জয়তী কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে কী যেন ভাবল। তারপর বললে, 'যা-ই করিস না কেন, সাবধানে এগোবি। কাউকে চোখে দেখে ভাল লাগলেও, ওই ভাল লাগাটাকে মুখে প্রকাশ না করে আগে জানতে হবে, লোকটির স্বভাব-চরিত্রটা কেমন। মোট কথা লক্ষণীয় ব্যাপার যেটা, সেটা হল গিয়ে, লোকটা মদে আর মাংসে অভ্যস্থ কি-না। কারণ মদে-মাংসে অভ্যস্থ বাঙালি পুরুষ মাত্রই সে জুয়ো আর নারী মাংসের প্রতি অতিমাত্রায় লোভী। এটা কিন্তু অস্বীকার করবার জো নেই। প্রমাণিত। আর এই কথাটাকে যদি কোনও বাঙালি মেয়ে তুড়ি মেরে হেসেই উড়িয়ে দেয়, তাহলে তার মতো বোকা মেয়ে এই বাংলাদেশে আর নেই।'

তৃতি নীরবে মাথা ঝাঁকালে। তার পর বললে, 'তোর এই উক্তিটা শোনার পর আমাদের দেশের আধুনিক ছেলেমেয়েরা হয়তো ভীষণ মনঃক্ষুন্ন হতে পারে। তবে, তোর এই কথাটা একেবারে নির্ভেজাল সত্যি। এটা আর কেউ মানুক বা না- মানুক, আমি মানি।'

'তৃতি...।'

'বল্।' জয়তীর দিকে চিকণ চোখে তাকাল তৃতি।

'তুই কি জানিস তৃতি, পুরুষমানুষের মনের মধ্যে কাম জিনিসটা ঠিক কী ভাবে লুকিয়ে থাকে?'

'না তো!' কৌতূহলে খানিক নড়েচড়ে বসল তৃতি, বললে, 'এ-ব্যাপারটা তো কখনও ভেবে দেখিনি। কীভাবে লুকিয়ে থাকে, তুই বল্।'

জয়তী মনেমনে একটা ধর্মীয় বই এবং বইটির লেখকের নাম মনে করতে চেষ্টা করে শেষটায় না মনে করতে পেরে বললে, 'কথাটা আমাদের মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উক্তি। উক্তিটা হল,- অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রিতে, ঘনগহীন জঙ্গলের মধ্যেকার মিশমিশে কালো একটা পাথরখণ্ডের ওপর মিশমিশে কালো একটা পিঁপড়া যে-ভাবে বিচরণ করে বেড়ায়, ঠিক তেমনি মানুষের গুপ্ত কামভাব আরও অধিকতর গোপনে বিচরণ করে বেড়ায় মানবহৃদয়ে।'

কথাটা শুনে তৃতি খানিকক্ষণ থ-মেরে জয়তীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তৃতির থ-মার্কা মুখখানা দেখে জয়তী বললে, 'কী, কথাটা সত্যি কি-না?'

কী একটা ভাবনার মধ্যে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে গিয়ে তৃতি মাথা ঝাঁকিয়ে কথাটিকে সমর্থন করে বললে, 'হুঁ। এটা দারুণ একটা কথা।'

জয়তী বললে, 'কেবল দারুণ একটা কথাই নয়। এটা ভারি দারুণ একটা তুলনামূলক উদাহরণ।'

তৃতি বিস্ময়ের সঙ্গে বললে, 'হ্যাঁ রে জয়তী, ধর্মের বইতে মানবচরিত্র নিয়ে এমনসব প্র্যাক্‌টিক্যাল কথাবার্তা লেখা থাকে নাকি?'

'থাকে বই কী। আমরা ধর্মের বইটই পড়ি নে ব' লে ভালমন্দের অনেক কিছুই জানি নে। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কথা এবং তাঁর আদর্শকে মেনে চললে মানুষের জীবনের মূল্য এবং সম্মান দুই-ই ক্রমে বাড়ে বই কমে না। আসলে, ধর্মভীরু হয়েও যাঁদের মনের মধ্যে ধর্মের কোনও গোঁড়ামী নেই, একমাত্র তাঁরাই বুঝি পারেন মানুষের প্রকৃতিগত গুণাগুণকে নিরপেক্ষ চোখে দেখে দার্শনিক একটা ব্যাখ্যা দিতে। এবং তাঁদের সেইসব মূল্যবান বাণীকে আপনার মধ্যে ধারণ করতে পারলে, নিজের অবস্থানটিকে সঠিক উপলব্ধি করা যায়। মনে হয়, হ্যাঁ, আজ একটা নতুন কথা জানলাম বটে।'

ধারেকাছের কোন্ একটা গাছে হঠাৎ খশ্‌মশ্ শব্দ হল।

একটা বাদুর বুঝি গাছ থেকে উড়ে চলে গেল। হ্যাঁ, খানিক আগে যে বাদুরটা পাঁচিলের ওধারের ডুমুরগাছটায় এসে বসেছিল, সম্ভবত সেই বাদুরটাই গাছের ডালপাতায় খশ্‌মশ্ শব্দ তুলে আর-একদিকে কোথায় যেন উড়ে গেল।

জয়তী জ্যোৎস্নার আলোর ভেতর মুখ তুলে তাকাল। দেখল, ডুমুরগাছের মাথা থেকে লম্বা দুই ডানা মেলে একটা বাদুর উড়ে চলে যাচ্ছে। উড়ে চলে যাওয়া কালো কুচ্‌কুচে সেই বাদুরটার দিকে একদৃষ্টিতে সে তাকিয়েই রইল। অনেকক্ষণ। এই দৃশ্যটি তাকে তার জীবনের ভয়ংকর এক রাত্রির কথা মনে করিয়ে দিল।

মুখ খুলল তৃতি, 'কী ভাবছিস?'

ঈষৎ চমকে উঠে জয়তী বললে, 'কই কিছু নাতো।' জয়তী যা ভাবছিল, তা সে তৃতির কাছ থেকে লুকোবার চেষ্টা করল।

আসলে, গত কয়েকটা মাস একটা রাতের অবাঞ্ছিত এক ঘটনায় সৃষ্ট মানসিক একটা আঘাতকে জয়তী আপনাতে অতি কষ্টে পোষণ করে আসছে নীরবে। সেই মানসিক যন্ত্রণাটির কথা যেমন সে কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারছে না, তেমনি আপনাতে সে সইতেও পারছে না। অথচ, জয়তীর চোখমুখ দেখে তার সেই মানসিক যন্ত্রণাটিকে অনুমান করাও কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

আজ সকালবেলা জয়তী আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত তৃতির সঙ্গে তার যে-সমস্ত কথা হয়েছে, তাতে, জয়তীর জীবনের তারে যে একটা সুর বড়ই বেসুরো হয়ে বাজছে, তা তৃতি সামান্য আঁচ করতে পারলেও তা যে ঠিক কী, সেটা সে এখনও পুরোপুরি বুঝতে পারেনি।

জয়তী নিজেকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখেই এতক্ষণ নানান কথা বলছিল। ডুমুরগাছে বসে থাকা বাদুড়টা হঠাৎ ডানা ঝট্‌পটানোর শব্দ তুলে উড়ে চলে যেতেই, সেইদিকে উদাস নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মুহূর্তে এইরকম এক চাঁদনি রাতের কথা জয়তীর

মনে পড়ে গেল।

সেই দিনটাও ছিল ঠিক এমনি এক জোছনা রাত। সেই জোছনা রাতে ঠিক এমনি করেই একটা বাদুর গাছের ডালপাতা থেকে ডানা ঝাপটার খশ্‌মশ্‌ শব্দ তুলে উড়ে চলে গিয়েছিল। যেন খুব ভয় পেয়েই বাদুরটা উড়ে চলে গিয়েছিল।...

সেও আজ প্রায় সাড়ে–তিনমাস আগেকার কথা।

দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার।

বেলা একটায় স্কুল ছুটি হয়ে যাবার পর জয়তী টিচার্স–রুম থেকে বেরিয়ে স্কুল–গেটে এসে দেখে, স্বরূপ চৌধুরি একটা রিকশা থেকে নেমে রিকশাঅলার হাতে ভাড়া গুনে দিচ্ছে। দেখে, জয়তী থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল স্কুল–গেটেই।

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে স্কুল–গেটের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই স্বরূপ চৌধুরির নজরে পড়ে গিয়েছিল জয়তী। এবং চোখাচোখি হতেই দু' জনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নীরবে হেসেছিল। তার পর স্বরূপ চৌধুরি হাসিমুখে জয়তীর সামনে এগিয়ে এসে বলেছিল, 'একেবারে ঠিক সময়ে এসে হাজির হয়েছি। আর–একটু দেরি হলেই তোমাকে পেতাম না।'

স্বরূপকে দেখে জয়তী তখন হাসছিল বটে, কিন্তু মৃদু ক্ষোভ প্রকাশ করে নীচু গলায় বলেছিল, 'তোমাকে না কতবার বলেছি, স্কুলে কখনও আসবে না। এতে করে আমাকে অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়।'

ডান–বাঁ তাকিয়ে স্বরূপ বলেছিল, 'একটা কথা বলবার জন্যেই এখানে আসা। নইলে কথাটা বলবার কোনও সুযোগই আজ আর পেতাম না।'

'কী কথা?'

'বলছি। তার আগে বলো, তুমি কি এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, বাড়ি ফিরছি।'

'তাহলে চলো, খানিকটা পথ হাঁটতে হাঁটতে কথাটা বলি।'

'ঠিক আছে। চলো।' বলে জয়তী হাঁটতে শুরু করেছিল।

স্বরূপও জয়তীর পাশাপাশি হাঁটছিল।

জয়তী বলেছিল, 'হ্যাঁ, এবার বলো, কী বলতে এসেছ?'

'আজ আকাশে কোনও মেঘ নেই।'

কথাটা শুনে জয়তীর দু' চোখের দৃষ্টি আপনা–আপনি আকাশের দিকে চলে গিয়েছিল। মেঘশূন্য স্বচ্ছ নীল আকাশটাকে দেখে বলেছিল, 'হ্যাঁ, আকাশটা আজ ভারি পরিস্কার। নীল।'

স্বরূপ বলেছিল, 'জানো জয়তী, আজ কিন্তু পূর্ণিমা।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। আমি অনেকদিন থেকেই ভাবছি তোমাকে সঙ্গে করে পূর্ণিমার চাঁদ ওঠা দেখব। তো আজ চলো না?'

'কোথায়?'

'লালচেডাঙা চেনো?'

'চিনব না কেন! ছোটবেলায় দল বেঁধে আমরা কত গেছি ওখানে, কত খেলা করেছি! জায়গাটা ভারি সুন্দর।'

'হ্যাঁ, জায়গাটা ভারি সুন্দর। ক' দিন আগে ওখানে গিয়ে আমি দেখে এসেছি। ওখানকার লেক এবং বিস্তীর্ণ বনপ্রান্তরের অদ্ভুত নিস্তব্ধতা আর নির্জনতার কোনও তুলনা নেই।'

'তা ঠিক।'

'আজ সন্ধ্যায় তুমি আমার সঙ্গে যাবে ওখানে? পূর্ণিমার চাঁদ ওঠা দেখব।'

একটু আমতা আমতা করে জয়তী বলেছিল, 'তা গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু ভাবছি দিনেদুপুরেই জায়গাটা এতই নির্জন আর খাঁ–খাঁ করে যে, সন্ধ্যাবেলায় ওখানে যেতে কেউ বড়–একটা সাহস করে না।'

'কেন! ভয় পাওয়ার কী আছে ওখানে!'

'নির্জনতার ভয়।'

স্বরূপ হেসে উঠে বলেছিল, 'তুমি তো আর ওখানে একা যাচ্ছ না, যে, ভয়ে গা ছম্‌ছম্‌ করবে। আমরা একসঙ্গেই যাচ্ছি। অতএব ভয়ের কোনও কারণ নেই।'

'তা নেই।'

'তাহলে চলো। লালচেডাঙায় গিয়ে আজ পূর্ণিমার চাঁদ ওঠা দেখে ঘন্টাদেড়েক সময় বিষম মজা করে কাটাব।'

জয়তী বিনা দ্বিধায় বলেছিল, 'ঠিক আছে, যাব।'

মনেমনে খুশি হয়ে উঠে স্বরূপ বলেছিল, 'ভারি খুশি হলাম, তুমি আমার অনুরোধটা রাখলে। সত্যিই আজ আমার একটা স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে।'

'কিন্তু একটা কথা, লালচেডাঙায় তুমি যাবে কিসে করে? রিকশায়?'

'হ্যাঁ, রিকশায়।'

মাথা নেড়ে জয়তী বলেছিল, 'আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে এক রিকশায় যাব না।'

'তাহলে?'

'তুমি তোমার মতো একটা রিকশা নিয়ে যাবে। আর আমি যাব আমার মতো। লালচেডাঙায় যাবার পথটা আমার চেনা।

বনবিভাগের অফিসের পাশ দিয়ে খানিকটা পথ এগিয়ে গেলে খাগড়াছড়ি লোকালয়ের শেষ প্রান্তে যাওয়া যায়।'

'হ্যাঁ, তা যাওয়া যায়। ওই পথেই তো আমি একবার লালচেডাঙায় গেছি।'

'সেখানে ছোট একটা বাজার মতো আছে।'

'আছে।'

'সেই বাজারে নানান দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টির একটা দোকান আছে।'

'ওইটে আমি খেয়াল করিনি।'

'ওই মিষ্টির দোকানের নামটা আমার মনে নেই। তবে ওখানে ওই একটাই মিষ্টির দোকান। তুমি ওখানেই অপেক্ষা করবে। তার পর আমরা ওখান থেকে একসঙ্গে পায়ে হেঁটে যাব লালচেডাঙায়। মাত্র দশ মিনিটের হাঁটা পথ।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভাল। তুমি যা বলবে, তা–ই হবে। তো ঠিক ক' টার সময় আমি ওই মিষ্টির দোকানে গিয়ে পৌঁছলে তোমার সুবিধে হয়?'

'এখন তো সন্ধে হয় সাড়ে–ছ' টায়। অতএব ছ' টা থেকে সওয়া–ছ' টার মধ্যে তুমি ওই মিষ্টির দোকানে হাজির থেকো।'

'ঠিক আছে, জয়তী দেবীর যা আজ্ঞা।'

স্বরূপের কথা শুনে জয়তী হেসে ফেলছিল, 'হয়েছে আর বলতে হবে না।'

এরপর ওদের দু' জনার ওই কথা অনুযায়ী সন্ধ্যের বেশ খানিকটা আগেভাগেই জয়তী বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। এবং বেড়াতে চলে গিয়েছিল তার মনের মানুষ স্বরূপ চৌধুরির সঙ্গে খাগড়াছড়ি লোকালয়ের বাইরে লালচেডাঙা লেকের ধারে।

চারদিকে কী বিশাল বিপুল নির্জন পাহাড়িয়া বন। কত আকারের কত ছোটবড় টিলা আর উঁচুউঁচু গাছগাছালিতে ভরা এই বনাঞ্চল ! ওখানকার লেকের ধারে দাঁড়িয়ে যে–দিকেই দু' চোখ মেলে তাকানো যায় সেদিকেই মস্ত মস্ত নানান গাছগাছালি। শাল, গেঁউরা, গরাণ, অর্জুন, ঝাঁকড়া তেঁতুল এবং নাম–না–জানা আরও অনেক গাছগাছালির সঙ্গে ঘন কাঁটাগাছের জঙ্গল চারদিকে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে আঁকাবাঁকা হয়ে চলে যাওয়া লেকটার খানিকটা অংশ দেখা যায়। তারপর লেকটি আড়াল হয়ে গেছে একটা টিলার ওধারে। পশ্চিমের দিকে নীচু হয়ে চলে যাওয়া অঞ্চলটিতে দীর্ঘ কাশ আর বনঝাউয়ের বন। লালমাটির কয়েকটা অপ্রশস্ত রাস্তা উঁচুনীচু ঢেউ খেলে চলে গেছে ছোটছোট টিলার ধার ঘেঁষে জঙ্গলের দিকে, হয়তো–বা জঙ্গলের ওধারের কোনও লোকালয়ে।

জয়তী সরূপকে সঙ্গে করে যে জায়গাটিতে গিয়েছিল সে জায়গাটিতে সরূপ আগে আসেনি। স্বরূপ গিয়েছিল জংলামন্দির বলে একটা মন্দির আছে, সেই দিকে।

যাইহোক, সেদিন বহুদিন পর লালচেডাঙায় গিয়ে জয়তী ওখানকার সৌন্দর্যে নতুন করে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। স্বরূপ আগে একবার লালচেডাঙায় এলেও এ–জায়গাটিতে আসেনি। সেও ওখানকার সৌন্দর্যে বিষম অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। লালমাটির উঁচু–নীচু একটা রাস্তা ধরে মিনিট দশেক হাঁটতেই দিনের আলো মরে এসেছিল। দূরের টিলা আর বনের গায়ে তখন নীলচে ধোঁয়ার একটা হালকা প্রলেপ পড়েছিল। স্বরূপের হাতে হাত রেখে জয়তী এগিয়ে যাচ্ছিল পশ্চিম দিকে। হঠাৎ সামনে একটা বিশাল বটবৃক্ষ দেখে জয়তী আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বলেছিল, 'ওই যে সেই বটগাছটা ! হ্যাঁ, এবার আমি চিনেছি এই জায়গাটাকে।'

স্বরূপ বলেছিল, 'কোন্ বটগাছটার কথা বলছ?'

'ওই যে সামনের ওই পুরানো বিশাল বটগাছটা। ঝুরি–ঝোলা, দেখছ না?'

'এই বটগাছটার সঙ্গে বুঝি তোমার আগে থেকেই পরিচয় আছে?'

'হ্যাঁ, পরিচয় আছে বই কী। এই গাছটাকেই যে আমি এখানে এসে অবধি মনেমনে খুঁজছিলাম ! এবার আমি খুঁজে পেয়েছি আমার সেই অতি প্রিয় বটগাছটাকে। জানো স্বরূপ, প্রায় দশ বছর পরে আজ আমি এখানে এলাম। আগে এই জায়গাটা ছিল বেশ ফাঁকা। নানান ঝোপেঝাড়ে এখন এ–জায়গাটির যেরকম পরিবর্তন হয়ে গেছে, তাতে, এখানকার কোনও কিছুই আমি ঠিকমতো চিনতে পারছিলাম না। ছোটবেলার আমরা ওই বটগাছের নীচে কত খেলা করেছি ! গোল্লাছুট, হাডুডু আরও কত কী ! দল বেঁধে আকাশ ফাঁটিয়ে এখানে কত গানও গেয়েছি। মনে পড়ছে আমার সেইসব দিনগুলোর কথা। কী মধুরই না ছিল আমাদের সেই ছোটবেলা !' এইসব কথা বলতে বলতে জয়তী স্বরূপের সঙ্গে ওই বটগাছটার নীচে এসে দাঁড়িয়েছিল। তখন টকটকে লাল সূর্যটা দূরদিগন্তের বনের পেছনে গিয়েছিল নেমে। তার খানিক বাদেই ঘন নির্জনতার মধ্যে পশ্চিমের আকাশকে ভারি অদ্ভুত রাঙিয়ে তুলে সূর্য ধীরেধীরে অস্ত গিয়েছিল।

সূর্য অস্ত যেতেই পুবের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছিল হেসে। ক্রমে সন্ধ্যা গড়িয়ে আঁধার একটু গাঢ় হতেই জ্যোৎস্নালোকে লালচেডাঙার চারদিক কী যে এক অপূর্ব রূপলীলায় ভরে উঠেছিল, সে কথা ভাষায় প্রকাশ করা দুরূহ।

যাইহোক, বিশাল ওই বটগাছটার নীচে বাঁধানো গোল পাকার ওপরটা শুকনো ঝরাপাতায় ছিল ভরা। ওরা দু' জন ওই গোল পাকার ওপরকার শুকনো ঝরাপাতা সরিয়ে খানিকটা জায়গা পরিস্কার করে নিয়ে অতি ঘন হয়ে বসেছিল পাশাপশি। বসে, পুবের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে জয়তী তার ছোটবেলাকার নানান গল্প বলায় মেতে উঠেছিল।

স্বরূপ নিজের একহাতের মুঠোয় জয়তীর একটা হাত নিয়ে চুপচাপ বসে গল্প শুনছিল। গল্প শুনতে শুনতে একসময় তার নিঃশ্বাস–প্রশ্বাস কেমন যেন গাঢ় হয়ে উঠেছিল এবং হাঁ–করে জয়তীর মুখের দিকেই ছিল তাকিয়ে। ব্যাপারটা যখন জয়তী টের পেল তখন তার আর কিছুই করবার ছিল না। সে ততক্ষণে যেন একটা বিরাটাকার অক্টোপাশের অসংখ্য হাতের শক্ত বন্ধনের মধ্যে নির্জীব একটা পদার্থের মতোই পড়ে ছিল। এমন একটা ঘটনা যে তার জীবনে এইভাবে হঠাৎ ঘটতে পারে, তা জয়তী কখনও কল্পনাও করেনি।

সেদিন ভারি একটা বেদনায় মনেমনে সে এই বলে বারবার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল,– হায়রে আমার ভালবাসা ! হায়রে আমার প্রেম ! হায়রে পুরুষের হৃদয় ! হায়রে পুরুষের প্রেম আর ভালবাসা !

জয়তীর জীবনে সেইদিনকার সেই পূর্ণিমার রাতে বড়ই অপ্রত্যাশিতভাবে ওই যে একটা অতি নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটেছিল লালচেডাঙার বিশাল বটগাছটার নীচেকার বাঁধানো পাকার ওপর, তাতে করে পুরুষ জাতটার ওপর জয়তীর বিশ্বাসটা চিরতরে গেছে হারিয়ে।

আজ এমুহূর্তে তৃতির সামনে বসা অবস্থায় সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা জয়তীর মনের মধ্যে নীরবে এমনই এক ঝড় তুলল যে, তাতে তার দু' চোখ জলে গেল ভরে। হঠাৎ অসাবধান বশত শাড়ির আঁচলের খুঁটে জয়তী তার চোখের কোণ দুটো মুছতেই তৃতি বিষম বিস্ময়ে বললে, 'ওমা ! জয়তী, তুই কাঁদছিস ! কেন কাঁদছিস ! ওমা ! কী কাণ্ড ! কী হয়েছে বল্? বল্ আমাকে?' বলে তৃতি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল জয়তীর মুখের দিকে।

বুক থেকে ঠেলে ওঠা নীরব কান্নাটিকে প্রাণপণে সামাল দেবার চেষ্টায় জয়তী ঈষৎ হাসিমুখে তৃতিকে বললে, 'ভাবিস না যে আমি কারও বিরহে কাঁদছি। এ আমার নিজের জন্যে নিজের কাঁদা। আসলে আজ আমার মনটা ভাল নেই রে তৃতি।'

তৃতি নিজের কাঁধ দুটো সামান্য নাচিয়ে বললে, 'কী জানি বাপু কী যে হয়েছে তোর। বলছিসও না। তবে আজ সারাদিন তোর সঙ্গে থেকে কথা কয়ে বুঝতে পারছি একটা কোনও সমস্যা তোর হয়েছে।' বলে তৃতি জয়তীর পিঠে আলত করে হাত রাখলে, বললে, 'নে চল। ঘরে যাই। অনেক রাত হয়ে গেছে।'

মুহূর্তে জয়তী তার ইচ্ছেশক্তিতে তার জীবনের সেই কলঙ্কময় অধ্যায়টিকে মনের মধ্যেই চেপে বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'সেই তো, অনেক রাত হয়ে গেছে। কাল সকালে তো তোর আবার ক্লাস, তাই না? চল্ শুয়ে পড়ি।'

'চল্।' বলে বারান্দার পাকার ওপর থেকে তৃতিও উঠে দাঁড়াল।

জয়তী বললে, 'কাল তোর ক্লাস সকাল ক' টায় ?'

'ন' টায়।'

'ফিরবি তো সেই বিকেলে?'

'না, ঠিক তা না। বেলা তিনটেয় আমার ক্লাশ শেষ...।'

'তারপর?'

'তারপর বাড়িতে এসে পরনের কাপড়–চোপড় পালটে শাড়ি পরে সেজেগুজে তোকে এক জায়গায় নিয়ে যাব।'

'কোথায়?'

'ওই যে ফোন করল না...।'

'ফোন করেছে তো কী?'

'তোকেও যেতে বলেছে।'

'সে তো তোর ব্যাপার। আমাকে আবার ন্যাজে বাঁধছিস কেন !'

'আরে বাবা, চল্ না কেন। ভদ্রলোকটিকে তো বলেছি...।'

'কী বলেছিস?'

'বলেছি আমার একটা বোন আছে। সেও যাবে আমার সঙ্গে।'

একটু বিরক্তি প্রকাশ করে জয়তী বললে, 'মাঝে মাঝে তুই কী যে সব ঝামেলা বাঁধাস না !'

'তা যে ঝামেলাই বাঁধাই না কেন, কাল বিকেলে আমার সঙ্গে তোকে যেতেই হবে। ছাড়ছি নে। জানিস, এর আগে ওঁর সঙ্গে কখনও কোনও কাফে–টাফেতে আমি যাইনি। তাই খুব নার্ভাস লাগছে। বুঝলি জয়তী, আমার ভাগ্যটা খুবই ভাল যে, তুই ঠিক আজই হঠাৎ এসে পড়েছিস, তাই টেলিফোনে তখন ওঁকে হ্যাঁ বলে দিয়েছি। নইলে, তোকে চিঠি লিখে ডেকে পাঠাতাম, তার পর যেতাম। কারণ, ভদ্রলোকটিকে দেখে কথা বলবার পর তুই সার্টিফাই করলে তবেই আমি এগোব, নইলে নয়। মোটে তো দু' সপ্তাহের পরিচয়। এটাকে ঠিক প্রেম বলা যায় না, বলা যায় ভাললাগা।'

কথা বলতে বলতে তৃতির সঙ্গে বসবার ঘরে ঢুকে জয়তী হাসতে হাসতে বললে, 'এই জন্যেই বুঝি তুই চুটিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনছিস !'

তৃতি লজ্জা পেল, 'ধ্যেত্ কী যে বলিস !'

তৃতি আজ নিজের ঘরে গিয়ে শুলো না, শুলো জয়তীর সঙ্গে একই বিছানায়।

বিছানায় শুয়ে, জয়তী তৃতিকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'তোর এই মিছে কথাটা যে সত্যি সে আমি জানি। কারণ মনের মধ্যে প্রেম প্রেম একটা ভাব অতিমাত্রায় ঘনীভূত না হলে, রবীন্দ্রসঙ্গীত মনে ঠিকমতো ধরে না। তা ভদ্রলোকটির নাম কী রে তৃতি? কোথাও চাকরি–বাকরি করে নাকি? না–কি এখনও ইউনিভার্সিটির ছাত্র?'

তৃতি চোখ বন্ধ করে দুষ্টুমির হাসি হাসলে, 'উঁ–হুঁ। ওঁর সম্পর্কে তোকে এখন কিচ্ছুটিও বলব না। আগে সরাসরি পরিচয় করিয়ে দিই। তারপর ওঁকে চোখে দেখে কথা বলেটলে যদি তোর ভাল লাগে, তাহলেই আমি ভেবে দেখব ফুলের তোড়া হাতে ওঁর দিকে এগোনো যায় কি–না।'

জয়তী কপালে হাত দিয়ে বললে, 'শোনো কথা ! আমার যাকে ভাল লাগবে, আমি যাকে ভাল বলব, তার সঙ্গে তুই প্রেম করবি, এটা কেমন কথা রে !'

তৃতি চোখেমুখে মিচমিচে হাসি হাসল। হেসে বললে, 'তুই তো বয়সে আমার চেয়ে দু' বছরের বড়। ওই হিসেবে তুই আমার গুরুজন। আর, বিশেষ করে প্রেম–ভালবাসার ব্যাপারে গুরুজনদের কথা শুনে চললে জীবনে নাকি বড়সড় কোনও খেসারত দিতে হয়

না। তো, গুরুজনদের কথা মতো চলে ব্যাপারটা একবার পরখ করেই দেখি না কেন?'

জয়তী রসিকতা করে হেসে বললে, 'গুরুদক্ষিণা দিবি তো?'

'অবশ্যই দেবো। তুই যা চাস তা-ই দেবো।'

'তা বেশ। খুশি হলাম শুনে। তবে কি জানিস, ব্যাপারটা তুই যতটা সহজ করে ভাবছিস, ততটা কিন্তু সহজ নয়। তিরিশ-চল্লিশ বছর সংসারকরা দম্পতিরাও কি একে অপরকে ঠিক মতো চিনতে পারে রে? পারে না। তো কয়েকটা মুহূর্ত একটা অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলে তাঁর কী আমি যাচাই করব? তাছাড়া, যাচাই করে তো প্রেম-ভালবাসা হয় না। চোখে হঠাৎ অসাধারণ চমক লাগা মানুষটি ছাড়া যে প্রেম অচল। এটাও তো একটা বড় কথা।'

'তা ঠিক।'

'তাহলে গুরুজনদের মতো কিছু কথা আগেভাগেই তোকে বলে রাখি?'

'হ্যাঁ বল্। আমি তো তা শুনতেই চাই।'

জয়তী বললে, 'আমি এতকাল জানতাম, জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানে যে একটা ছোট সেতু আছে, সেই সেতুর ওপর দিয়ে যৌবনকাল থেকে আমৃত্যু মনের মানুষটির হাতে হাত রেখে নির্ভীক এগিয়ে চলার নামই প্রেম। কিন্তু বড়ই দুঃখজনক যে, অমন নির্ভীক পথ চলার দিনটি গেছে চলে। কারণ, আজকাল গোড়াতেই প্রেম এমনই এক ক্ষণমাত্র-ক্ষ্যাপা-ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তা রাতারাতি মনকে ছাপিয়ে দেহকে স্পর্শ করবেই। এবং এই ক্ষণমাত্র-ক্ষ্যাপা-ব্যাধিটির হাত থেকে যেন মেয়েদের কুমারিত্বের কোনও নিস্তার নেই। এখানে আর-একটা কথা তোকে বলে রাখি শোন্।'

'বল্।' বলে তৃতি জয়তীর গায়ের ওপর একটা হাত রাখল আলত করে।

একটু ভেবে নিয়ে জয়তী বললে, 'আমি মানি যে, শরীরী তৃষ্ণার জল—কাম। আত্মার তৃষ্ণা মিটায় ভালবাসা। কিন্তু কাম বিনা প্রেম আপনার চোখে বন্দনার আলো দেখতে পায় না। প্রেমেই আত্মার মুক্তি। কাম, আত্মার সেই মুক্তিকে নব নব রঙে তোলে রাঙিয়ে। কিন্তু প্রেমের ছলে যারা মেয়েদের কুমারিত্ব কিংবা মানসম্ভ্রমকে হরণ করে বসে, তাদেরকে কখনই প্রেমিক বলা যায় না। বলা যায় কামুক-ধর্ষক, ভণ্ড।'

তৃতি আঁতকে উঠে বললে, 'উরেব্বাস মনের মধ্যে ভয় ধরিয়ে দিলি যে! ওহ্! নো! দিস ইজ নট গুড্ অ্যাট অল।'

'না রে, তোকে ভয় দেখানো নয়। তোকে সাবধান করিয়ে দেয়া আর কী। যাইহোক, তুই ঘাবড়াস নে। কাল আমি তোর সঙ্গে যাব। তবে, একটা কথা, খালি হাতে যাস নে। একতোড়া ফুল নিয়েই যাস। এটা একটা সৌজন্য, ভদ্রতা।'

তৃতি আনন্দে জয়তীকে নিজের বুকের সঙ্গে চেপে ধরল, 'ওহ্ জয়তী, ইউ আর সো কাইণ্ড! হাও নাইস ইউ আর!'

'উইশ ইউ গুড্ লাক্।' বলে জয়তী সামান্য হেসে পাশ ফিরে শুয়ে বললে, 'তৃতি, এবার তুই ঘুমো। গুড্ নাইট।' তৃতিও বললে, 'ও.কে.। গুড্ নাইট।'

পরের দিন সকালে ঠিক সাড়ে আটটায় বইখাতার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে তৃতি চলে গেল কলেজে। এরপর বেলা যখন দশটা বাজল, তখন জয়তীও বেরোল বাইরে। বেরিয়ে, নানাসব অশুভ ভাবনা মাথায় নিয়ে, পায়ে হেঁটেই সন্ধানীচোখে ঘুরে বেড়ালো রেলইস্টিশানের আশপাশের এলাকায়। সেইসঙ্গে খানিকটা সময় বিপনিবিতানের ভেতরকার এবং বাইরেকার দোকানপাটের সামনে দিয়ে ডান-বাঁয়ে তাকাতে তাকাতে হেঁটে বেড়ালো। তার পর ব্যর্থব্যথিত মনে দুপুর একটা বাজবার আগেই বাড়িতে ফিরে এল। ফিরে এসে, ধীরেসুস্থে গোসলটসল সেরে মনটাকে সতেজ করবার চেষ্টায় ক্যাসেট প্লেয়ার বাজিয়ে রবীন্দ্রঙ্গীত শোনায় মন বসাতে চেয়েছিল। কিন্তু জয়তীর মনে এবং মননে জগৎসংসারের সুর তখন এতই বেসুরো হয়ে বাজছিল যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনায় তার মন আর বসল না। গান শোনা বাদ দিয়ে সে চুপচাপ বাড়ির পেছনকার বারান্দায় চলে গিয়ে পা ঝুলিয়ে বসলে। ঠিক গত রাতের মতো। তবে একাকী।

বেলা যখন দুটো, তখন সজনী টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখে জয়তীকে গিয়ে বললে, 'বড়আফা আসেন, টেবিলে খাবার দেওয়া হইছে।'

জয়তীর শরীর মন কোনওটাই খুব একটা ভাল নেই। শরীর-মন ভাল নেই বিধায় ক্ষিদেও সে অনুভব করছে না। ভাবিত মনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সজনীকে বললে, 'ঠিক আছে। তুমি যাও। আমি খানিক পরে খেয়ে নিচ্ছি।'

সজনী বললে, 'আফা খানিক পরে খাবার ঠাণ্ডা হইয়া যাইব। ভাত-তরকারি গরম গরম না খাইলে, ওই খাওয়ায় কোনও মজা নাই। আফা আসেন, গরম গরম ভাত আগে খাইয়া লন। তার পর যা খুশি মনে লয় করেন।'

অগত্যা জয়তীকে বারান্দা থেকে উঠতেই হল। খাবার টেবিলে গিয়ে বসতেই হল। বসে, চীনেমাটির একটা থালায় সামান্য ভাত সামান্য শবজি আর সামান্য গোরুর মাংসের ভুনা তুলে নিয়ে মাখিয়ে খেতে গিয়ে জয়তীর কেমন যেন বমি পেয়ে যাচ্ছিল। দু' চার মুঠো শবজি-মাখা ভাত মুখে দেওয়ার পর হঠাৎ বমি ভাবটা এত বেশি বেড়ে গেল যে, জয়তী ভাতের থালা ছেড়ে গেলাসে জগ থেকে জল ঢেলে নিয়ে উঠে পড়ল।

সজনী খাবার টেবিলের সামনেই ছিল দাঁড়িয়ে। বললে, 'কী হইল বড়আফা! শরীরটা কী আফনের ভালা নাই?'

গেলাসের জল দুই এক ঢোক খেয়ে গেলাসটা টেবিলের 'পরে নামিয়ে রেখে জয়তী বললে, 'হ্যাঁ রে। শরীরটা আমার আজ ভাল নেই। গতকালকার বাসে চড়ার ধকলটা বোধহয় গায়ে সয়নি।'

সজনী বললে, 'মা-রে! আসলেই যে উঁচানীচা পথ আর ঝাঁকি, তাতে শরীর ভালা থাকনেরই তো কথা না। আচ্ছা বড়আফা, ভাত না খান, অন্য কিছু খাইবেন? কী খাইবেন কন, আমি অহনি বাানাইয়া দেই।'

'না না, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। তোমাকে এখন আর কিচ্ছু বানাতে হবে না। বাইরের খোলা বাতাসে খানিকটা সময় বসে থাকলে

শরীরটায় হয়তো আরাম লাগবে। ক্ষিদে পেলে তোমাকে আমি বলব।'

সজনী বললে, 'ঠিক আছে আফা। বারান্দায় আফনেরে একটা ইজিচেয়ার বার কইরা দিতেছি। আফনে ইজিচেয়ারে আরাম কইরা বইয়া থাকেন।'

'ঠিক আছে। দাও।'

সজনী ফোল্ড করা একটা ইজিচেয়ার বাড়ির পেছনকার বারান্দায় খুলে পেতে দিল। জয়তী সেটায় পিঠ হেলান দিয়ে আরাম করে বসল। বসে, সজনীকে বললে, 'এবার তুমি তোমার গোসল-খাওয়া সেরে নাও গে।'

'আচ্ছা।' বলে সজনী চলে গেল তার নিজের কাজে।

খানিক বাদে সজনী বাড়িঘরের বাকি কাজকর্মগুলো শেষ করে গোসল করতে যাওয়ার আগে জয়তীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে, 'বড়আফা।'

'বলো।'

'এখন কেমন লাগতেছে?'

'ভাল।'

'আফা, হজমী খাইবেন?'

'হজমী!'

'জ্বি বড়আফা। ফয়েজী দাওখানার হজমী।'

'কী দাওয়াখানা?'

'ফয়েজী দাওয়াখানা।'

'ওই দাওয়াখানার হজমী তুমি এখানে কোত্থেকে পেলে!'

'আমার বাবা আমারে দিয়া গেছে।'

'তোমার বাবা এরমধ্যে এখানে এসেছিল নাকি?'

'জ্বি বড়আফা, আসছিল। দুই মাস আগে আর-একবার আসছিল। আইসা আমারে ময়মনসিংয়ের ফয়েজী দাওয়াখানার হজমী দিয়া গেছে। আমার বড়ই প্রিয় হজমী এইটা। মুখে রুচি না থাকলে, এই হজমী খাইলেই রুচি ফিরা আসে।'

'তাই?'

'খাইবেন? দিমু একটা প্যাকেট? বাবা হেই সোম্ হজমীর অনেকগুলা ছোটছোট প্যাকেট দিয়া গেছে।'

'ঠিক আছে। আনো দেখি একটা হজমীর প্যাকেট।'

সজনী সঙ্গেসঙ্গে বাড়ির ভেতরে চলে গিয়ে তার টিনের বাক্সের ভেতর থেকে হজমীর একটা প্যাকেট বের করে এনে জয়তীর হাতে দিল।

জয়তী ইজিচেয়ারে আধশোওয়া থেকে উঠে বসে হজমীর প্যাকেটটা খুলে তা থেকে এক চিমটি হজমী জিভের ওপরে ফেলে ইজিচেয়ারে পুনরায় হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল। তার পর মুখে হজমীর স্বাদটা পুরোপুরি অনুভব করবার পর মৃদু হেসে জয়তী বললে, 'হ্যাঁ সজনী, হজমীটা খুব ভাল। মুখে বেশ লাগছে।'

খুশি উপচে পড়া মুখে সজনী বললে, 'তাইলে আপনি একটু একটু কইরা হজমি খান, আমি গোসলটা সাইরা লই।'

জয়তী আর-এক চিমটি হজমী জিভের ওপর ফেলে বললে, 'ঠিক আছে।'

এদিকে, বেলা তিনটেয় কলেজের ক্লাস শেষ হবার পর কলেজের বাসে চেপে বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় সাড়ে তিনটে মতো বেজে গেল তৃতির।

তৃতি বইখাতার ব্যাগ তার পড়ার ঘরে রেখে, ঘরে কোথাও জয়তীকে না দেখতে পেয়ে সজনীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার আপামণি কোথায়?'

সজনী বললে, 'বড়আফায় বাড়ির পিছনের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বইসা আছেন। উনার শরীরটা মনে হইতাছে ভালা না।'

'তাই!' বলেই তৃতি বসবার ঘরটা পেরিয়ে বাড়ির পেছনকার বারান্দায় গিয়ে হাজির হল। দেখল, জয়তী চোখ বন্ধ করে ইজিচেয়ারে আধ শোওয়া অবস্থায় বসা। বললে, 'তুই এখানে বসে! সজনী বলল, তোর শরীরটা নাকি ভাল না।'

তৃতিকে দেখেই জয়তীর মনটা যেন অনেকখানি হালকা হয়ে গেল। বললে, 'যাক, তুই ফিরেছিস।' বলে জয়তী যেন স্বস্তির একটা শ্বাস ফেলে বাঁচল।

'কেন রে! একা একা খুব বোর ফীল্ করছিলি বুঝি?'

'তা কিছুটা তো বটেই।'

'বাইরে গিয়েছিলি নাকি?'

'গিয়েছিলাম।'

'কোথায় কোথায় গেলি?'

'রেল-ইস্টিশান আর বিপনিবিতান।'

'কেনাকাটা করতে গিয়েছিলি বুঝি?

'না। এমনি গিয়েছিলাম, শহরটাকে দেখতে।'

'কেমন দেখলি?'

‘সেই আগের মতোই আছে সব।’

তৃতি হাঁক পেড়ে ডাকল সজনীকে, ‘সজনী, ও সজনী।’

সজনী এসে হাজির হল বাইরের বারান্দায় তৃতিদের সামনে।

তৃতি বললে, ‘টেবিলে চা–নাস্তা দাও।’

সজনী বললে, ‘দেই আফা। কিন্তু বড়আফায় দুপুরে কিছুই খায় নাই।’

‘ওমা ! কেন !’ বলে জয়তীর দিকে তাকিয়ে বললে, ‘কেন রে দুপুরে কিছুই খাসনি কেন !’

‘ইচ্ছে করেনি। ভাল লাগছিল না।’

‘এখন ভাল লাগছে তো?’

‘তা লাগছে।’

‘এখন কিছু খা–দা।’

‘না। শুধু চা হলেই চলবে। রাতে ঠিকমতো খাবখন।’

কথা আর না বাড়িয়ে তৃতি বললে, ‘ঠিক আছে। রাতে তাহলে ঠিকমতো খাস, নইলে শরীর খারাপ করবে।’ বলে তৃতি সজনীকে বললে, ‘তুমি এখন বরং এক কাজ করো, কয়েক স্লাইস পাউরুটি টোস্ট করে মাখন আর চীজ্ লাগিয়ে দাও।’

জয়তী বললে, ‘শোন্ তৃতি, আমি এখন শুধু চা খাব, অন্য কোনও কিছু না।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে।’ বলে তৃতি সজনীকে বললে, ‘সজনী, তুমি তাহলে চা–ই দাও। এখানেই নিয়ে এসো চা। আমি হাতমুখ ধুয়ে আসছি।’ বলে তৃতি পুনরায় জয়তীকে বললে, ‘তুই তাহলে এখানেই বোস্, আমি এখুনি আসছি।’

অবশেষে গল্প করতে করতে ওদের দু’ জনের চা খাওয়া শেষ হল সোয়া চারটেয়। চা খাওয়া শেষ হবার পর শুরু হল ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে–বসে তৃতির সাজগোজ করা।

তৃতি নীল রঙের আমেরিকান জর্জেটের একটা শাড়ি পরেছে। শাড়ির রঙের সঙ্গে মিল করে ব্লাউজ। রেশমের মতো নরম অথচ ঝরঝরে চকচকে তার মাথার চুল কাঁধ থেকে খানিকটা নামায় পিঠের ওপর সমান করে ছাঁটা। হালকা প্রসাধনীর প্রলেপ তার গালে আর ঠোঁটে। কপালে দুই ভুরুর মাঝখানে ছোট্ট একটা লাল টিপ। এতেই বেশ দেখাচ্ছে তৃতিকে।

এদিকে জয়তীর সাজগোজ করতে তেমন একটা ইচ্ছেই করছে না। যে টুকু করল তা তৃতির চাপে পড়েই করল।

অথচ, কিছুদিন আগে জয়তীরও এমন একটা সময় গেছে। তৃতির মতো ঠিক এইরকম একটা সময়। তখন তার কী অসীম একটা ইচ্ছে ছিল। আনন্দ ছিল। সাহস ছিল। কেবলই ইচ্ছে হত, প্রতিদিন প্রতিক্ষণ নতুন নতুন সাজে সেজে ভালবাসার মানুষটির সামনে গিয়ে রাঙামুখে দাঁড়াতে।

কিন্তু আজকাল সাজগোজে জয়তীর কোনও মনই নেই। সারাক্ষণ মনেমনে সে কেবলই আফসোস করে মরে যায়,– কেন যে ভালবাসতে গিয়ে একটিবারও মনে এল না, রূপে মুগ্ধ হওয়াটাই মোহ আর গুণীর গুণে মুগ্ধ হওয়ার নাম ভালবাসা।...

আজ আবার তৃতিকে নিয়েও তার নতুন একটা ভাবনা এই যে, তৃতিও যেন তার মতো কোনও বড় ভুল করে না বসে।

সাজগোজ শেষে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় তৃতি জয়তীকে সঙ্গে করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। হেঁটে সদর রাস্তায় এসে একটা বেবীট্যাক্সী ডেকে তাতে উঠে বসল। যেতে হবে বিপনিবিতানের কাছে।

পথ সামান্যই।

রিকশাতে গেলেও খুব একটা সময় লাগে না। তবুও বেবীট্যাক্সী নিল তৃতি। বেবীট্যাক্সি নিল মনের একটা ভয়ে। কারণ, তৃতি একবার রিকশা উলটে ছিটকে পড়ে গিয়েছিল রাস্তার ওপর। পড়ে গিয়ে, পীচের রাস্তার ঘষা খেয়ে হাতে–পায়ের নুনছাল উঠে গিয়েছিল। মাথাটা কোনওরকমে রক্ষা পেয়েছিল। তবে, কোমরে চোট লেগেছিল খুব। এবং সেই কারণে তাকে চিটাগাং মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও শুয়ে থাকতে হয়েছিল একটানা তিনদিন।

আসলেই চিটাগাংয়ের রিকশাগুলো এমনই ধাঁচে তৈরি যে, চড়ায় কোনও সুখ নেই। সীটে বসবার পর কেবলই মনে হতে থাকে, এই বুঝি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে গেলাম। তাছাড়া রাস্তাগুলো বড্ড উঁচু–নীচু আর খানা–খোন্দলে ভরা। আবার কোথাও কোথাও রাস্তা এমনভাবে উঁচুতে উঠে গেছে যে, প্যাডলিং সীট্ থেকে নেমে রিকশাঅলাকে রিকশা টেনে টেনে উঁচুতে তুলতে গিয়ে ঘর্মাক্ত হয়ে যেতে হয়। রিকশাঅলার এ–রকম রিকশা টানা দেখতে ভারি কষ্ট হয় তৃতির। রিকশার সীটে বসে নিজেকে তখন কেমন যেন অপরাধী অপরাধী ব’ লে মনে হয় তার। আবার যখন নামা রাস্তায় রিকশা তীরবেগে ছুটে চলে, তৃতি তখন রিকশার হুডের দুই পাশ শক্ত হাতে চেপে ধরে ভয়ে কাঠ হয়ে বসে থাকে। এইসব কারণেই রিকশা চড়ায় তৃতির আগ্রহটা গেছে উবে। তাই কোথাও যেতে হলে বাসে নয়তো বেবীট্যাক্সীতে চড়ে যাওয়াটা ঢের ভাল ব’ লে মনে করে তৃতি। হোক্ না সে পথ সামান্য পথ।

নন্দনকানন থেকে গ্যাঁ গ্যাঁ শব্দে বেবীট্যাক্সী ছুটে চলেছে। বিকেলের ভিড়ের রাস্তা সত্ত্বেও পাঁচ মিনিটেই বিপনিবিতানের সামনে এসে গেল বেবীট্যাক্সী। তৃতি বললে, ‘থামো ভাই থামো।’

অমনি ফটর ফটর করতে করতে বেবীট্যাক্সীটা দাঁড়িয়ে গেল বিপনিবিতানের সামনেকার রাস্তার একপাশে।

বাইরে তখন সোনা সোনা রঙের আলোর ছড়াছড়ি। বাড়িঘর গাছপালার ছায়া দীর্ঘ হয়ে গেছে। খানিকটা দূরের দিকে তাকালে সামান্য ধোঁয়া ধোঁয়া মনে হলেও সব মিলিয়ে সুন্দর বিকেল। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তৃতি জয়তীকে সঙ্গে করে জেব্রাক্রসিং পার হয়ে বিপনিবিতানের উলটো পাশের বড় বিল্ডিংটায় গিয়ে ঢুকল। যাবে দোতলায়। তাই লিফ্‌টে না চেপে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে লাগল। ওরা দোতলায় গিয়ে বসবে ক্যাফে টেকনাফ–এ।

ক্যাফে টেকনাফ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বেশ বড়সড় একটা রেস্তরাঁ। এখানকার পরিবেশটা বেশ ছিমছাম ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। এই

রেস্তরাঁতে যে–সব খাবার–দাবার পাওয়া যায়, তা দামে একটু চড়া হলেও বেশ সুস্বাদু। তবে, চড়া দামটা পুষিয়ে যায় এখানকার শিল্পিক পরিবেশের খাতিরে। ক্যাফের ভেতরকার চারপাশের দেয়াল বাংলাদেশের সুনিপুণ চারু ও কারু শিল্পের নানান নিদর্শন দিয়ে সাজানো। তাছাড়া নানান রাগরাগিনীতে বাঁশির সুমধুর সুর এখানে সর্বক্ষণ এমনই হালকা শব্দে বাজানো হয় যে, শুনে মনে হয়, বাঁশির সুরটা যেন বহুদূর থেকেই ভেসে আসছে। আসলে, ক্যাফে টেকনাফের কাউন্টারের বাঁ–পাশের ফাঁকা জায়গাটিতে সুনিপুণ একটা গ্রামীণ পরিবেশ তৈরি করে ছোট একটা কুঁড়েঘরের সামনে বিশেষ কায়দায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে মাঝারি আকারের জীবন্ত একটা বাবলাগাছকে। এবং সেই বাবলাগাছের গায়ে বাঁশি বাজানোর ভঙ্গিমায় হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে একমানুষ মাপের কালোপাথরের একটা মূর্তি। সেই মূর্তিটির দু' হাতে ধরা বাঁশিতে তার ঠোঁট ছোঁয়ানো। দেখে মনে হয়, কালোপাথরের ওই মূর্তিটিই যেন তার কুঁড়েঘরের সামনে বাবলাগাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একমনে বাঁশি বাজাচ্ছে। ক্যাফের ভেতরকার এই অপূর্ব আমেজটুকু নেওয়ার জন্যই বিকেলবেলায় অফিস ফেরতা নানান পেশার যুবকযুবতী আর সৌখিন আড্ডাবাজদের ভিড়ে জমজমাট হয়ে ওঠে ক্যাফে টেকনাফ।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে তৃতি জয়তীকে বললে, 'আমরা কিন্তু বেশ আগেভাগেই এসে গেছি রে। আসলে, আরও আধঘন্টা পরে আমাদের আসা উচিত ছিল।'

জয়তী নীরবে হেসে বললে, 'ঠিক আছে, কোনও অসুবিধে নেই। ততক্ষণ আমরাই নাহয় এ–কথা সে–কথা বলে সময় কাটিয়ে দেবখন।' বলে পা ফেলে তিন–চার ধাপ সিঁড়ি ওপরে উঠতেই জয়তীর মাথা হঠাৎ টলকে উঠল। সেইসঙ্গে, জয়তী অনুভব করতে লাগল, তার চোখের সামনে যা–কিছু–আছে সব যেন তাকে কেন্দ্র করে বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে। জয়তী সিঁড়ির রেলিং চেপে ধরে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। অস্ফুটে বললে, 'তৃতি আমাকে একটু ধর।'

তৃতি পাশেই ছিল। হাত বাড়িয়ে জয়তীকে ধরে বললে, 'কী রে কী হল !'

চোখ বন্ধ রেখেই জয়তী বললে, 'কোথাও একটু বসি, মাথাটা বড় টলকাচ্ছে।'

জয়তীর কপালে ঘাম ফুটে বেরিয়েছে। গা পাকাচ্ছে। মুখে জল কাটছে। পেটের ভেতর থেকে বমি যেন ঠেলে ঠেলে উঠছে।

জয়তীর মুখের দিকে তাকিয়ে তৃতি ঘাবড়ে গিয়ে বললে, 'তোকে তো খুব কাহিল দেখাচ্ছে রে। কেন রে ! আচ্ছা ঠিক আছে, নে চল্‌ এক্ষুনি বাড়ি ফিরে যাই। তোর বিশ্রামের দরকার।'

জয়তী তৃতির হাত শক্ত করে ধরে থেকে বললে, 'অস্থির হোস নে, দাঁড়া। ও বেচারা এসে যদি তোকে খুঁজে না পায়, তাহলে মনে বড় কষ্ট পাবে। আসলে কাউকে কথা দিলে কথা ঠিকমতো রাখবার চেষ্টা করতে হয়।'

'এখন মাথা ঘোরাটা কি একটু কমেছে ?'

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে কমে আসছে।' বলে আস্তে আস্তে চোখ দুটো খুলে তৃতির মুখের দিকে তাকাল জয়তী।

তৃতি বললে, 'দোতলা পর্যন্ত উঠতে পারবি তো ?'

'তা পারব।'

তো বাকি সিঁড়ি ক' টা তৃতির হাত ধরে জয়তী দোতলায় গেল উঠে।

এখন মাথাঘোরা ভাবটা আর তেমন নেই। তবে শরীরের ভেতরটা কেমন যেন ঘেঁটে যাচ্ছে জয়তীর।

ক্যাফে টেকনাফে ঢুকে চারজনার একটা টেবিলে গিয়ে বসল ওরা দু' জন। ফোমঅলা চেয়ারের পিঠে পিঠ ঠেস দিয়ে বেশ আরাম করে বসল জয়তী। তৃতিও বসল আরাম করে। পায়ের নীচে নরম দামি কার্পেট।

চা–কফির মজাদার সুগন্ধ ভুরভুর করছে ক্যাফেতে। চা–কফির এই কড়ামিষ্টি গন্ধটা জয়তীর কাছে খুবই ভাল লাগছে। এই চা–কফির গন্ধেই যেন জয়তীর গা গুলানো ভাবটা আরও তাড়াতাড়ি কেটে গেল।

জয়তী তৃতিকে জিজ্ঞাসা করল, 'তৃতি, ভদ্রলোক ঠিক ক' টার সময় এখানে আসবেন বলে কথা দিয়েছেন ?'

তৃতি হাতঘড়িতে অভ্যাস বশত তাকিয়ে বললে, 'সাড়ে ছ' টার মধ্যে।'

জয়তীর চোখ গিয়ে পড়ল ক্যাফে টেকনাফের প্রবেশদরজার মাথার ওপরকার দেয়ালঘড়িটার ওপর, 'এখন তো বাজে মোটে ছ' টা।'

'হ্যাঁ। একটু আগেভাগেই আসা হয়ে গেছে আমাদের। এক কাজ করি, ফান্টা আনাই ? ফান্টা খেতে খেতে তোর সঙ্গে কথা বলি।'

জয়তী বললে, 'আগে ভদ্রলোক আসুক তারপর ফান্টা কী যা মনে চায় তা–ই আনাস। এখন বস্‌। বসে বসে কথা বলি।'

অনেকক্ষণ থেকেই জয়তীর বারবার মনে হচ্ছিল, কী যেন একটা করবার কথা ছিল, অথচ করা হয়নি। কী যেন একটা বাদ পড়ে গেছে। ক্যাফের সমস্তটার ওপর চোখ বুলিয়ে সেইটিকে মনে করতে জোর চেষ্টা করল জয়তী। সঙ্গেসঙ্গে মনে পড়ল ফুলের তোড়ার কথা। তাই জয়তী তক্ষনি তৃতিকে বললে, 'হ্যাঁ রে, তুই কী রে !'

তৃতি জয়তীর গলার স্বরে চমকে উঠে বললে, 'কেন কী হল আবার ?'

'তোর না ফুলের তোড়া আনবার কথা ছিল ?'

'অ্যাইজ্জ্যা !' বলে তৃতি চোখদুটো গোলগোল করে কপালে হাত দিয়ে বললে, 'একদম ভুলে গেছি। ফুলের তোড়াটা তো আমার শোবার ঘরেই ফেলে এসেছি।'

'বেশ করেছিস, কাজের মতোই একটা কাজ করেছিস !'

'থাক গে। ফুলের তোড়া দিয়ে আর কাজ নেই। এমনি দেখা হলেই তো হয়। ওটা বরং ঘরে ফিরে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখবখন।'

'তা তুই রাখিস। কিন্তু ফুলের তোড়া ছাড়া এরকম সাক্ষাৎটা কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া মনে হচ্ছে না ? অন্তত আমার কাছে তো তাই

মনে হচ্ছে।'

'তাহলে?'

'সাড়ে ছ' টা বাজতে এখনও দেরি। নীচে কোথাও ফুলের দোকান আছে?'

'আছে।'

'তো চল্। আগে একটা ফুলের তোড়া কিনে নিয়ে আসি।'

'তোর শরীর ভাল নেই। তুই বস্। আমি একদৌড়ে গিয়ে নিয়ে আসছি।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, যা। তবে, বেশি দেরি করিস নে যেন।'

'আচ্ছা।' বলে তৃতি টান পায়ে ক্যাফে থেকে বেরিয়ে গেল।

নীচে নানাপদের বেশ কয়েকটা দোকান পেরিয়ে তবেই একটা ফুলের দোকান। তৃতি সেই ফুলের দোকানটায় ঢুকে বেছে বেছে দেখে পাঁচমিশালী ফুলের একটা তোড়া পছন্দ করল। তবে এটা আগের তোড়াটার মতো তত সুন্দর নয়।

দোকানীর হাতে দাম মিটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই সামনে কাকে যেন দেখতে পেয়ে লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল তৃতি। বললে, 'ও-মা! আপনি এসে গেছেন!'

একগাল হেসে ভদ্রলোক তৃতির মুখের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে আস্তে করে বললেন, 'নীল শাড়িতে তোমাকে কিন্তু ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, তুমি যেন কোনও-এক রূপকথার দেশের নীলপরী।'

তৃতি লজ্জা পেয়ে মৃদু হাসল।

এরপর ফুলের দোকান থেকে বেরোতে বেরোতে ভদ্রলোক তৃতিকে বললেন, 'তুমি একা এসেছ? তোমার সঙ্গে না তোমার এক বোনের আসবার কথা?'

'হ্যাঁ, সেও এসেছে।'

ডান-বাঁ তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'কোথায় তিনি?'

'তাকে ক্যাফে টেকনাফে বসিয়ে রেখে এসেছি। চলুন, পরিচয় করিয়ে দিই।'

'বেশ চলো।' বলে ভদ্রলোক তৃতির সঙ্গে এগিয়ে চললেন।

ক্যাফে টেকনাফের প্রবেশ পথের দিকে তাকিয়ে বসে আছে জয়তী।

মিনিট পনেরো সময় পার হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। এই সময়টুকুতে জোড়ায় জোড়ায় ভারি সুন্দর সাজগোজ করা বেশ কিছু যুবক-যুবতী ক্যাফে টেকনাফে প্রবেশ করল হাসিমুখে। ওরা জোড়ায় জোড়ায় এসে বসল এ-টেবিলে সে-টেবিলে মুখোমুখি, কেউ-বা পাশাপাশি। ওদেরকে একনজর দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, ওদের চোখেমুখে কী অসীম নীলস্বপ্ন! কী অসীম একটা মোহে এবং নেশায় এবং আকর্ষণে ওরা একে অপরের চোখের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে আছে অপলক। ছোটছোট কথার ফাঁকে ওরা একে অপরের আঙুলের সামান্য স্পর্শে মনেমনে ভারি উৎফুল্ল হয়ে উঠছে! এবং ওই সমস্ত ছোটছোট কথার রসের ছোঁয়ায় ওদের মনের মধ্যেকার নীলস্বপ্নের লজ্জা-লজ্জা খেলাটি ওদেরকে ভারি অদ্ভুত ঘিরে রেখেছে! সে সত্যিই দেখবার মতো। দু' একটা কী কথা হতেই ক্ষণেক্ষণে ওরা কী যে আলোকিত কী যে পুলকিত হয়ে উঠছে একে অপরের মুখের দিকে মুগ্ধচোখে তাকিয়ে। ওদের যৌবনসুলভ চঞ্চলতার রকমসকম দেখে জয়তীর এই মুহূর্তে খুবই ভাল লাগছে। খুউব। এই মুহূর্তে নিজের কোনও মানসিক জ্বালাযন্ত্রণার কথা বা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাওয়ার কথা তার আর মনেই পড়ছে না। না অতীতের কোনও কথা, না বর্তমানকার কোনও কথা। এমন কী ভবিষ্যতের ভাবনাটিও নয়।

অনেক্ষণ হয়ে গেল তৃতির কোনও দেখা নেই। পনেরো মিনিটেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে। একতোড়া ফুল কিনতে কি কারও এত দেরি হয়! কী জানি, ফুলের দোকানে হয়তো-বা এখন বিকেলবেলাকার কেনাকাটার ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে পড়ে তৃতি হয়তো এখনও ফুলের দোকানের লাইনেই আছে দাঁড়িয়ে।

জয়তীর চারপাশের কয়েকটা টেবিলে জোড়ায়-জোড়ায় বসা এবং গল্পরত প্রেমিক-প্রেমিকাদের যৌবনের লাবণ্যোৎসব দেখবার ফাঁকে ফাঁকে জয়তী ক্যাফের প্রবেশ পথের দিকেও মাঝেমাঝে লক্ষ করছিল।

এই মুহূর্তে জয়তীর দৃষ্টি ক্যাফে টেকনাফের প্রবেশ পথের ওপর। সেই প্রবেশ পথে জয়তী হঠাৎ কাকে যেন তৃতির সঙ্গে দেখে বিষম এক বিস্ময়ে নিজের মেরুদণ্ড সোজা করে বসল। এ কী! তৃতির সঙ্গের ওই লোকটি কে! স্বরূপ না? স্বরূপ চৌধুরি! খাগড়াছড়ি কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক স্বরূপ চৌধুরি! হ্যাঁ, লোকটিকে তো স্বরূপ চৌধুরি ব' লেই মনে হচ্ছে! হায়রে কপাল! এও কী সম্ভব! নিজের চোখকে জয়তী যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না। তৃতির একহাতে ফুলের একটা তোড়া। মুখখানা ওর ভারি হাসিহাসি। চোখে সুগভীর নীলস্বপ্ন। পায়ে ওর কোমল ছন্দের চঞ্চলতা। তৃতি পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে ক্রমশ। সঙ্গে স্বরূপ চৌধুরিও। অ্যা চীট্। অ্যা লায়ার। অ্যা সান অভ্ অ্যা বীচ্!

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল জয়তী। তৃতি এবং স্বরূপ পাশাপাশি হেঁটে এগিয়ে আসছে। স্বরূপ নিশ্চয়ই জয়তীকে এখনও খেয়াল করেনি। করলে, থমকে দাঁড়িয়ে যেত। এক পাও আর এগোতে পারত না। জয়তী এবার দাঁতে দাঁত চেপে বিষম এক আক্রোশে এগিয়ে গেল ওদেরই দিকে। গিয়ে দাঁড়াল একেবারে ওদের মুখোমুখি। তৃতি হাসছে। লজ্জারাঙা হাসি। কিন্তু জয়তীকে দেখে স্বরূপের মুখটি গেছে শুকিয়ে।

তৃতি তার সঙ্গের ভদ্রলোকটিকে জয়তীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার আগেই জয়তী তৃতিকে গম্ভীরস্বরে বললে, 'ফুলের তোড়াটা আমার হাতে দে তৃতি।'

জয়তীর দৃঢ় কণ্ঠস্বরে হকচকিয়ে গিয়ে তৃতি অবাক চোখে তাকাল জয়তীর মুখের দিকে। তাকিয়ে দেখল, জয়তীর সমস্ত মুখখানা মুহূর্তে লালচে হয়ে উঠেছে। ঠোঁট দুটো তার কাঁপছে মৃদুমৃদু। চোখ দুটো যেন জ্বলছে অগ্নিশিখার মতো। ঠিক যেন আগুনের

দুটো হলকা ঠিকরে বেরোচ্ছে জয়তীর দু' চোখ থেকে। তৃতি নিষ্প্রভমুখে ফুলের তোড়াটা দিয়ে দিল জয়তীর হাতে।

জয়তী ঘৃণাভরা চোখে স্বরূপের দিকে তাকিয়ে কঠিন কণ্ঠে বললে, 'এই দেশটা আজকাল অসৎ দেবতায় গেছে ভরে। তোমাদের মতো ধুরন্ধর মিথ্যুক কামুক লালস দেবতারা এদেশের সহজসরল কুমারি মেয়েদের হাতের ফুলটি না পেলে তো আজকাল আর বাঁচে না। তাই না? এই নাও সেই ফুল।' বলে জয়তী ফুলের তোড়াটা স্বরূপের মুখের ওপর ছুড়ে মারল। তারপর দাঁতচাপা ক্ষ্যাপা কণ্ঠে বললে, 'দ্যাখো, ভাল করে চেয়ে দ্যাখো এবং ভেবে দ্যাখো, এই ফুলের তোড়াটি পাওয়ার মতো কোনও যোগ্যতা তোমাতে আর অবশিষ্ট আছে কি–না! না নেই। কোনও যোগ্যতা নেই। তুমি কি জানো, ফুলের সৌরভ–সৌন্দর্যের কাছে তুমি কী তুচ্ছ কী কুৎসিত কী হীন! ইউ আর রিয়েলী অ্যা সান অভ্ অ্যা বীচ্।' বলে রাগে দুঃখে উত্তেজনায় জয়তী স্বরূপের দিকে দু' কদম এগিয়ে গিয়ে হাতের চড় দেখিয়ে বললে, 'এইটেই তোমার যোগ্য উপহার হওয়া উচিত ছিল, বুঝেছ ব্যাস্টার্ড স্বরূপ চৌধুরি।'

জয়তীর চেঁচামেচিতে ক্যাফের সবক' টা টেবিলে বসা সকলের দৃষ্টি তখন স্বরূপ, তৃতি আর জয়তীর ওপর গিয়ে নিবদ্ধ হয়েছে। অনাকাঙ্খিত এমন একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে তৃতি রীতিমত ঘাবড়ে গেছে।

জয়তী তখনও বাঘিনীর মতো রাগে গজরাচ্ছিল। ঠিক এমন সময় সৌখিন আড্ডাবাজদের ভেতর থেকে কে একজন জয়তীর পক্ষ নিয়ে চড়া গলায় বলে উঠল, 'দিদি, বলেন তো আচ্ছা করে পেঁদিয়ে দিই ভদ্দরলোককে, বুঝিয়ে দিই ছুঁচোমি আর ধূর্তামির শেষ পরিণতিটা কী।'

সৌখিন আড্ডাবাজদের এই কথার কোনও উত্তর না দিয়ে জয়তী গলা নামিয়ে তৃতিকে বললে, 'চল্ তৃতি। ভালবাসার ছলে যে পুরুষ প্রজাপতির মতো ফুলেফুলে উড়ে বেড়ায় তাকে বিশ্বাসও করা যায় না, ভালবাসাও যায় না। এদের ভালবাসা কামপীড়িত দেহসর্বস্ব ভালবাসা। সত্যিকার অর্থে এদের মন ব' লে কিছুই নেই, আছে কেবল মনোমদ, এরা নীচহৃদয়, প্রকৃতি আর প্রবৃত্তিতে এরা নীচত্বের শীর্ষে।'

তৃতি তার কপালভুরু কুঁচকে ভদ্রলোকটির দিকে একবার তাকাল। তাকিয়ে, মনেমনে বিষম বিস্ময়ে ভাবল,– কী আশ্চর্য! বাইরে থেকে দেখতে এমন একটা সুদর্শন সুপুরুষ যার মুখের কথাবার্তায় তার উন্নত শিক্ষাদীক্ষা আর সুরুচির পরিচয় মিলে, সে কী করে এতটা নীচ হয়!'

ক্যাফে থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল তৃতি আর জয়তী।

জয়তী বললে, 'একটা বেবীট্যাক্সী ডাক।'

তৃতি বললে, 'এখন যাবি কোথায়? বাড়ি?'

'না।'

'তবে কোথায়?'

'কোনও একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে আগে আমাকে নিয়ে চল্।'

'কেন রে! ক্লিনিকে কেন! তোর কি আবার মাথা ঘুরছে? শরীর কি খারাপ লাগছে? খুব বেশি খারাপ?'

নিষ্ঠুর অথচ খুবই শান্ত এবং ধীর গলায় জয়তী বললে, 'না না, আর না, আজই পেটের অবাঞ্ছিত জারজপিণ্ডটাকে ফেলে দিতেই হবে। আমি অমন অপদার্থ হীনচরিত্র পুরুষের সন্তান পেটে ধরে রেখে নিজেকে আর কলঙ্কিত করতে চাই নে।'

জয়তীর কথা শুনে তৃতির বিস্ময়ে সীমা ছাড়িয়ে গেল। তৃতি নির্বাক, স্তব্ধ। সীমাহীন বিস্ময়ে কয়েকটা মুহূর্ত জয়তীর মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে তৃতি আকাশ–পাতাল নানান কথা ভাবল। তার পর কী মনে হতেই জয়তীকে সায় দিয়ে বললে, 'চল্ জয়তী, তাই চল্। তুই আমাকে আজ বড় বাঁচা বাঁচিয়ে দিয়েছিস।'

পশ্চিমের আকাশটাকে নানারঙে রাঙিয়ে তুলে সূর্য তখন অস্ত গেছে। এবং পুবের দিকটায় সন্ধ্যার শ্যামলিমা ধীরেধীরে আকাশ থেকে ছেয়ে আসতে শুরু করেছে মাটির দিকে। রাস্তায়–রাস্তায় দোকানপাটে বৈদ্যুতিক বাতিও তখন উঠেছে জ্বলে।

অদূরে চিটাগাং রেলইস্টিশানের কোথায় যেন শান্টিংয়ের কয়লার ইঞ্জিন হঠাৎ আকাশবাতাস ফুঁড়ানো তীক্ষ্ণ ভেঁপু বাজাল বারদুই। এবং ওই তীক্ষ্ণভেঁপুর পরপরই তৎক্ষণিক মন–কাঁদানো যে–একটা উদাসী নীরব নিস্তব্ধতায় চারপাশ ভরে উঠল, সেই উদাসী–নীরব–নিস্তব্ধতা, জয়তীর প্রেম যে আজ একেবারে রিক্তশূন্য হতে চলেছে, জয়তীর ভালবাসার বন্ধন যে আজ চিরতরে ছিন্ন হতে চলেছে, সেই সত্যটিকে বারবার মনে করিয়ে দিয়ে জয়তীকে নীরব একটা হাহাকারে কাঁদিয়ে ছাড়লে।

তৃতি জয়তীর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে জয়তীর বুকের মধ্যেকার সেই নীরব করুণ কান্নাটিকে যেন নিজের সমস্ত হৃদয় দিয়ে স্পষ্ট অনুভব করলে।

এরপর খানিকটা পথ পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তৃতি একসময় জয়তীর একটা হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিল তুলে। কিন্তু মুখে আর কিছুই বললে না।

সমাপ্ত

Zahid Kawnine
Nordengatan 3 : 48
752 64 Uppsala, Sweden
E-mail: zahid_k49@hotmail.com